ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬২ বর্ষ ২৭ সংখ্যা ।। ১৬ ফাল্গুন, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ১ মার্চ, ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com

সুপ্রীম কোর্টকে সামনে রেখে মন্দির ভাঙছে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সুপ্রিম কোর্ট নানা বিষয়ে রায় দিলেও রাজ্য সরকার সেসব মেনে চলতে খুব একটা গরজ দেখায় না। কিন্তু সম্প্রতি সর্বোচ্চ আদালতের একটি রায় পশ্চিমবঙ্গের বাম সরকারের খুব মনে ধরেছে। তা হলো, সরকারি জমি বা স্থানে যে সব মন্দির রয়েছে তা ভেঙে ফেলতে হবে। সমস্ত রাজ্যকেই সুপ্রিম কোর্ট এই রায় মানতে হলফনামা দিতে চলেছে। তার জেরে বাম শাসিত সরকার রাজ্যের সরকারি জমিতে নতুন করে আর মন্দির বা পূজাস্থল নির্মাণ করতে দেওয়া হবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেইসঙ্গে বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে যে সব মন্দির সরকারি জমিতে গড়ে উঠেছে সেগুলি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সমস্ত জেলার জেলাশাসকদের ডেকে বলে দেওয়া হয়েছে সরকারি জমিতে গজিয়ে ওঠা মন্দিরের সুমারি করতে হবে। তারপর একে একে তা ভেঙে ফেলতে হবে। জানা আছে, পূর্ত, পঞ্চায়েত, ভূমি সংস্কার, পুরদপ্তরের বহু পরিত্যক্ত জমিতে পূজার জন্য অনেকে স্থানেই ছোটকাঠামোর রীতি রয়েছে। সেটাকে পূর্ণাঙ্গ মন্দির বলা যায় কি যায় না তা প্রশ্নের ব্যাপার। কিন্তু বিভিন্ন স্থানে এভাবে কালী, শনি, শিবের মন্দির নির্মাণ হয়েছে। হতে পারে তা কোনও ক্যানেলের পাড়ে সেচ দপ্তরের জমিতে। যে জমি সেচ দপ্তর কোনওদিনও ব্যবহার করতে আসবে না। হয়তো একইভাবে কোনও রাজ্য সড়কের ধারেও কালী বা শিব মন্দির নির্মাণ হয়ে থাকতে পারে। যদি কখনও নতুন রাস্তা হয় তাহলে সেই মন্দির অনত্র সরিয়ে নিতে বেশির ভাগ স্থানেই কোনও আপত্তি ওঠে না। তা সত্ত্বেও বামফ্রন্ট সরকারের মনে হচ্ছে সরকারি স্থানে মন্দির রাখা যাবে না। ভেঙে ফেলতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর হাতে থাকা স্বরাষ্ট্র দপ্তর এর দায়িত্বে রয়েছে। তৈরি হচ্ছে বিস্তারিত (এরপর ৪ পাতায়)

জেহাদী প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কর্মসংস্থানের সুযোগ ভারতে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বাজেট অধিবেশনের শুরুতেই গত ২২ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিল সন্ত্রাস প্রসঙ্গে একপ্রকার হুঁশিয়ারিই দিয়েছেন। কিন্তু সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরমের পাক-প্রশ্নে অবিমৃষ্যকারী ভূমিকা নিয়ে কূটনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই। পাক অধিগৃহীত কাশ্মীরি যুবকদের নিয়ে আচমকাই দরদ উথলে উঠেছে কেন্দ্রের। তাদের এহেন দরদের কারণ—যেহেতু পাকিস্তানের দখলে থাকা কাশ্মীর আদতে ভারতেরই অংশ তাই সেখানকার যুবকদের 'সুখ-দুঃখের' দায়িত্বও সরকারের উপরেই বর্তায়। এটা যদি ইউপিএ সরকারের 'রাজনৈতিক ব্যাখ্যা' হয়, তবে 'কূটনৈতিক ব্যাখ্যা' হচ্ছে—এই স্ট্রাটেজীর মাধ্যমে পাক অধিগৃহীত কাশ্মীরের মানুষের হৃদয় ও মন জয় করা। কিন্তু যাঁরা হৃদয়ে গুমরে মরছেন, জম্মুর সেই উদ্বাস্তু হিন্দুদের ভারতের নাগরিকত্ব দেবার প্রয়োজনই অনুভব করেননি কেন্দ্র-রাজ্য কোনও সরকারই। এই 'হৃদয় ও মন জয় করা'র কাজে প্রথম অগ্রসর হন জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। তিনিই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব পাঠান যে পাকিস্তানের বিপক্ষে ঠাণ্ডা ও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে জিততে গেলে পাক অধিগৃহীত কাশ্মীরের যুবকদের, যারা জঙ্গী

সাংবাদিক সম্মেলনে চিদাম্বরম-ওমর।

শিবিরে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল, তাদের ভারতে পুনর্বাসন দেওয়াটা একান্ত জরুরি। এই সুযোগটা লুফে নিয়ে কাশ্মীরে গিয়ে ওমর আবদুল্লাকে পাশে বসিয়ে ওই জঙ্গি প্রশিক্ষণ নেওয়া যুবকদের কর্মসংস্থানের দেবার কথা ঘোষণা করেও দেন চিদাম্বরম। যে কারণে (এরপর ৪ পাতায়)

মুসলিম সংরক্ষণ

কেন এই সর্বনাশা পদক্ষেপ

দেবজ্যোতি রায়।। বিপ্লবী তথা নাস্তিক বামপন্থার সর্বশেষ কীর্তি ধর্মের ভিত্তিতে মুসলিমদের চাকুরীতে সংরক্ষণ, যা একেবারেই আমাদের সংবিধান বিরোধী। এ ধরনের বিধান ভারতীয় সংবিধানে নেই। শুধু ভারতেই নয়, পৃথিবীর কোনও দেশেই এই নিয়ম নেই। এ কথা আমাদের নান্দনিক ভাষাতত্ত্ববিদ (!) মুখ্যমন্ত্রী জানেন। আর জানেন বলেই বলে দিয়েছেন, না না আমরা ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ দিচ্ছি না; আমরা মুসলমান সমাজের ক্রিমিলেয়ারকে বাদ দিয়ে গরীব-গুর্বো পিছিয়ে পড়া সাধারণ মুসলমানদের সংরক্ষণ দিচ্ছি। কারা পিছিয়ে পড়া সাধারণ মুসলমান? যাদের মাসিক আয় ৩৭,৫০০ টাকা বা তার কম।

সোজা-সাপ্টা

এ কথা শুনে ইসলাম ধর্মের মহাপণ্ডিত কলকাতার এক ইমাম সাহেব বললেন, মুসলমান সমাজে পিছিয়ে পড়া বা অনগ্রসর বলতে কেউ নেই। তাই সমগ্র মুসলমানদের জন্যই সংরক্ষণ চাই। কমিউনিজম নামক আলখাল্লা পরে সাম্যবাদের অন্যতম অতন্দ্র প্রহরী (!) মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা আর এক কাঠি উপরে উঠে বললেন, 'কোনও বাছ-বিচার নয়, সব মুসলমানের জন্য সংরক্ষণ চাই। আভি দাও, জলদি দাও।' এটা না দিলে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে না।

আসুন, এই প্রসঙ্গে আমরা দেশ-ভাগের ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরাই। মুসলিম লীগ সেদিন সমগ্র ভারতবাসীর কথা না ভেবে বৃটিশ ভারতের শতকরা ২৪ জন মুসলমানের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র **(A Separate Homeland for the Muslims)** গঠনের আন্দোলন শুরু করে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রথমে ওই আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল। এমনকী গান্ধীজী এ কথাও বলেছিলেন যে, তিনি জীবিত থাকতে ভারতকে দ্বিখণ্ডিত হতে দেবেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে বৃটিশের মদতপুষ্ট চরম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজ মুসলিম লীগের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। সেদিন লীগের হাতে তাদের ধর্মশাস্ত্র বর্ণিত দ্বি-জাতি তত্ত্বের মতো মোক্ষম অস্ত্র ছিল। এই অস্ত্র হাতে নিয়ে জিন্নাহ্ সাহেব ১৯৪৬-এ কলকাতায় মহাদাঙ্গা ঘটিয়ে এবং ওই বছরই অক্টোবর মাসে ত্রিপুরা ও (এরপর ৪ পাতায়)

জেহাদী নিন্দায় 'রা' নেই কেন?

।। **গূঢ়পুরুষ**।। বর্তমান সময়ে দেশের ভিতরে সবচেয়ে বড় বিপদ দুটি। ইসলামী জেহাদ এবং মাওবাদ। কারণ এই দুই মতবাদেরই মাধ্যম হিংসা। বোধ-বুদ্ধি যুক্তিহীন হিংসা। লাগাম ছাড়া সন্ত্রাসের মাধ্যমে জনসমাজে আতঙ্ক ছড়ানো। উদ্দেশ্য ভীত ত্রস্ত মানুষ নতজানু হয়ে এই সন্ত্রাসবাদীদের ক্রীতদাস হবে। সন্ত্রাসের এই দুই ফেরিওয়ালাদের আসল মুখটি সর্বদা ঢাকা থাকে। কারও কালো কাপড়ের টুকরোয় আবার কারও গামছায়। এরা মুখ দেখায় না। দেখালে এদের স্বরূপ মানুষ চিনে ফেলবে। আদতে জেহাদী এবং মাওবাদীরা কাপুরুষ। আর কাপুরুষ বলেই তারা সফ্ট টার্গেট খোঁজে। যাতে বিনা বাধায় নির্বিচারে খুন করা যায়।

পুণের জার্মান বেকারিতে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে ১৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন। এঁদের অধিকাংশই স্থানীয় শিক্ষায়তনের ছাত্রছাত্রী। সারা দেশ থেকে তারা পুণের শিক্ষায়তনে পড়াশুনার জন্য যায়। জেহাদীরা জার্মান বেকারি নামের এই ভারতীয় রেস্তোরাঁকে সফট টারগেট হিসাবে বেছে নিয়েছিল কারণ এখানে পুণের ছাত্রছাত্রীদের ভিড়টাই বেশি ছিল। নিরপরাধ অল্পবয়সী ছাত্রছাত্রীদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে ইসলামের জয়যাত্রা কীভাবে হবে তা বোঝা দুষ্কর। গোপনে ব্যাগের মধ্যে বোমা রেখে জেহাদীরা নিরাপদ দূরত্বে চলে যাওয়ার পর বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। একে চরম কাপুরুষতা ছাড়া অন্য কী বলা যায়। মানবিক মুখহীন, নীতিহীন, এই সন্ত্রাসকে কি নামে ডাকব? শুধু অবাক হতে হয় যখন দেখি ভারতের মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা, মৌলানা-মৌলবীরা অযোধ্যায় রামমন্দির গড়ায় বাধা দিতে একাট্টা হয়ে পথে নামে অথচ জেহাদের নামে নিরপরাধ মানুষকে নির্বিচারে হত্যার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করতে দেখি না। মুসলিম শিক্ষাবিদ বুদ্ধিজীবীদের পুণের বিস্ফোরণে নিহত ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্য একটিও মোমবাতি জ্বালাতেও দেখিনি। শাবানা আজমি-র মতো প্রতিবাদিনীর কণ্ঠ কেন রুদ্ধ জানতে ইচ্ছা করে। যেমন, জানতে ইচ্ছা করে জেহাদিরা হত্যা করলে তা শাবানাদের কাছে ধর্মযুদ্ধ। হিন্দুরা পাল্টা মারলে তা দাঙ্গা। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ। জানিনা কতকাল এমন কাজির বিচার ভারতে চলবে।

উত্তর বিহারের জামুই এলাকার একটি প্রত্যন্ত গ্রামে হামলা চালিয়ে মাওবাদীরা ২৩ জন দরিদ্র গ্রামবাসীকে গুলি করে হত্যা করেছে। কেন? এরা কী মাও তত্ত্বে শ্রেণী শত্রু? কেন এই নির্বিচার হত্যা তা স্পষ্ট বলা হয়নি। অভিযোগ যে এই গ্রামের কাছেই পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইতে কয়েকজন মাওবাদি মারা যায়। মাওবাদীদের সন্দেহ যে গ্রামের লোকই পুলিশের চর। তাই তাদের হত্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ স্রেফ সন্দেহের ভিত্তিতে স্ত্রী পুরুষ শিশুদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের শিলদায় ২৪ জন ই এফ আর জওয়ানকে হত্যা করেছে মাওবাদীরা। কারণ, জওয়ানদের ক্যাম্প বসানো হয়েছিল শিলদায় সি পি এমের পার্টি অফিসের সুরক্ষার জন্য। সাধারণ মানুষের স্বার্থে নয়। তাই মাওবাদীদের প্রত্যাঘাত। তবে যৌথ বাহিনীকে সামনে রেখে পার্টির নেতারা জঙ্গলমহলে গ্রাম দখলের রাজনীতি করছে এমন অভিযোগ যে পুরোপুরি মিথ্যা নয়, শিলদার ঘটনায় তা বোঝা গেছে। শাক দিয়ে আর মাছ ঢাকা যাচ্ছে না বুঝতে পেরে মুখ্যমন্ত্রী এখন নানা রকম সাফাই দিয়ে চলেছেন। বলছেন বিরোধী দল তৃণমূলের সঙ্গে মাওবাদীদের গোপন আঁতাত আছে। তাই কিছু করা যাচ্ছে না। অথচ এই মুখ্যমন্ত্রীই একদা বলেছিলেন, 'আমরা ২৩৫ আর ওরা (এরপর ৪ পাতায়)

কলকাতার নিকিতা জঙ্গিদের আশ্রয়দাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। নাম তার নিকিতা। তবে আরও নাম আছে তার। ২০০২-এর ২২ জানুয়ারি, কলকাতার আমেরিকান সেন্টার-এ হামলার ঘটনায় ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসবাদী আফতাব আনসারি ও আসিফের সঙ্গে সেও ধরা পড়েছিল। দিল্লী পুলিশের সূত্র অনুযায়ী নিকিতা জেহাদি ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন জঙ্গিদের সঙ্গে যুক্ত। ২০০৮-এর দেশের বিভিন্ন শহরে তো বটেই, খোদ রাজধানী দিল্লীতেও ধারাবাহিক বিস্ফোরণে সে জড়িত ছিল। ৬ বছর জেলখাটার পর সে গত ২০০৮-এ ছাড়া পায়। কলকাতায় আমেরিকান সেন্টারে হামলার ঘটনায় ৬ জন পুলিস নিহত এবং অন্য ১২ জন আহত হয়েছিল। এইসব জেহাদিদের আশ্রয়ের ব্যবস্থাটা নিকিতাই করেছিল। পুণের সাম্প্রতিক বিস্ফোরণেও সে জড়িত বলে পুলিশের সন্দেহ।

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর নিকিতা কয়েকজন আফ্রিকান নাইজিরিয়াবাসীর সঙ্গে বসবাস করছিল। পুলিশ তাদেরকেও গ্রেপ্তার করেছে। তাঁদের নাম—রিচার্ড এডুগেনস্, টমি ওহেজো, অ্যারন এবং আইভরি কোস্টের বাসিন্দা লুসিয়েন। আদালতে এরা বরাবর নিকিতার সঙ্গে দেখা করতে আসত। গত ১৮ মাস ধরে নিকিতা তাদের সঙ্গে ছিল। নিকিতার অন্যান্য নাম হলো—মিসেস খান্না, মিসেস নিশা। নিকিতা কলকাতার এন্টালির লরেটো কনভেন্টের ছাত্রী। ইংরেজীতে কথা বলায় তুখোড়। সম্প্রতি সে ঠগবাজিতে নেমেছে—অনলাইন আইটেম বিক্রির নামে। ইতিমধ্যে গুজরাটের এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে প্রায় সাড়ে চারলাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে বলে দক্ষিণ দিল্লীর পুলিশ সুপার ধালিওয়াল জানিয়েছেন। তার ডেরায় হানা দিয়ে পুলিশ বিভিন্ন বিখ্যাত ওষুধ কোম্পানীর নামে ভিজিটিং কার্ড, তিনটি ল্যাপটপ, আন্তর্জাতিক সিমকার্ড উদ্ধার করেছে।

আমেদাবাদের ব্যবসায়ী হেমচন্দ্র ব্যারোটের অভিযোগেই পুলিশ হানা দিয়েছিল। তারপরই সব ফাঁস হয়ে যায়। এমনকী ওই নাইজিরিয়ানদের ভিসার মেয়াদও শেষ। নিকিতা ও তার দলবল ভারতে জঙ্গি জেহাদি কার্যকলাপ খোদ দিল্লীতে বসেই চালিয়ে যাচ্ছে।

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!
SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।
যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।
যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –
Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221
SBI Life
INSURANCE
With Us, Your's Sure

মুসলিম সংরক্ষণের বিরোধিতায় লীগাল এড ফোরাম

নিজস্ব প্রতিনিধি।। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের মুসলিম ওবিসিদের জন্য সরকারি চাকুরিতে দশ শতাংশ সংরক্ষণের এবার তীব্র প্রতিবাদ জানাল অল ইন্ডিয়া লীগাল এড ফোরাম। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতা প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ফোরামের সাধারণ সম্পাদক জয়দীপ মুখার্জী বুদ্ধদেব সরকারের এই সিদ্ধান্তকে সংবিধান বিরোধী এবং দেশভাগের আর এক চক্রান্ত বলে অভিহিত করেন। শ্রীমুখার্জীর বক্তব্য, আমাদের দেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতবর্ষকে 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র' বলা হয়েছে। ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য সংবিধানে ২৯/৩০ নম্বর ধারা রয়েছে। সেজন্যই ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ হতেই পারে না। অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ , অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণকে বে-আইনী বলে ইতিমধ্যেই রায় দিয়েছে। ফোরামের স্পষ্ট বক্তব্য হল, ধর্ম নয়, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়ার ভিত্তিতে গরীব ভারতবাসীদের জন্য সংরক্ষণ হওয়া উচিৎ।

প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ ডাঃ বিক্রম সরকার বলেন, হিন্দুদের মধ্যে নির্দিষ্ট করা

বক্তব্য রাখছেন বি পি সাহা। পাশে ডাঃ বিক্রম সরকার, রণেন্দ্রনারায়ণ রায় ও জয়দীপ মুখোপাধ্যায়।

ও বি সি শ্রেণীভুক্ত ৬৬টি জনগোষ্ঠী থাকলেও মাত্র ১৩টি গোষ্ঠীই উপকৃত, বাকীরা নন। ক্যাবিনেটে আলোচনা, গেজেট নোটিফিকেশন ছাড়াই দশ শতাংশ সংরক্ষণের ঘোষণা একেবারেই অনুচিত এবং অনভিপ্রেত। সকল পশ্চাৎপদ এবং গরীবদের জন্য ধর্মমত নির্বিশেষে সংরক্ষণ করা উচিত।

প্রাক্তন আই পি এস ডঃ বি পি সাহা বলেন, আমরা শান্তিপূর্ণ এবং নীতিনিষ্ঠ আন্দোলন করব। চাকরি দিলেই উন্নতি হয় না। এটা ভাঁওতা ছাড়া কিছু নয়। মুসলিমদের উন্নয়ন চাইলে তুরস্কের মতো আধুনিক হতে হবে। প্রাক্তন বিচারপতি রণেন্দ্রনারায়ণ রায় বলেন, কমিউনিস্টরা বরাবর সবকিছু চাপিয়ে দেয়। ফোরাম ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের বিরোধী। রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের প্রাথমিকে ইংরেজী বর্জনের নীতি রাজ্যের ৪০/৪৫ বছর বয়সের সবাইকে পিছিয়ে দিয়েছে। মঞ্চে ছিলেন, ডাঃ বিক্রম সরকার, রণেন্দ্রনারায়ণ রায়, জয়দীপ মুখার্জী ও বি পি সাহা।

এই সময়

চীন চটল

ওবামা-র ওপর বেজায় চটেছে চীন। কারণ, ওবামা আমেরিকা সফররত দলাই লামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। চীনের চটার কারণ দলাই লামার আমেরিকা সফরের মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল তিব্বতের বিষয়টিকে বিশ্বের দরবারে 'ফোকাস' করা। এবং স্বীকার করতেই হচ্ছে, এই কাজে তিনি পুরোপুরি একশ' শতাংশ সফল। তিব্বতীয় সংস্কৃতির পাশাপাশি তিব্বত নিয়ে চীন ও ভারতের নীতিও তিনি বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেন। বলাই বাহুল্য, চীনকে তুলোধনাই করেন তিনি সেখানে। তিব্বতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্যতা ও গণতন্ত্রকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা এবং সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বেজিং যে চূড়ান্ত ব্যর্থ তা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন দলাই লামা।

শুভ উদ্বোধন

সামনে দুটি ফটো। একটি ফটোতে আছেন সঙ্ঘপ্রণেতা কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার, অন্যটাতে গুরুজী এম এস গোলওয়ালকর। তার নিচে দাঁড়িয়ে আছেন এন পদ্মলোচনানন্দন। স্থান—কোল্লাম। অকুস্থল—আর এস এসের স্থানীয় কার্যালয়। কার্যক্রম—সেই কার্যালয়ের উদ্বোধন। পদ্মলোচনানন্দন উদ্বোধন করছেন শঙ্খধ্বনির মধ্যে চিরাচরিত ভারতীয় প্রথায় পিতলের প্রদীপ জ্বালিয়ে। সবই ঠিক আছে, কিন্তু পদ্মলোচনানন্দনের পরিচয়টা চমকে দেওয়ার মতো। তিনি হলেন কোল্লাম পুরসভার মার্কসবাদী কমিউনিস্ট মেয়র তথা সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর একজন সদস্য। একজন কমিউনিস্টের এহেন 'সাম্প্রদায়িক আচরণে' বেজায় চটেছে কেরলের রাজ্য সিপিএম। তবে তারা এটাও বুঝেছে, শাক দিয়ে আর বেশিদিন মাছ ঢাকা যাবে না।

ওবামা আসছেন

এবছরের শেষের দিকে ভারত সফরে আসার সম্ভাবনা উজ্জ্বল মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার। আমেরিকার এক সংশ্লিষ্ট সরকারি আধিকারিকের কাছ থেকে এই তথ্য জানা গেছে। প্রসঙ্গত, সামনের এপ্রিলে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত ৪৩টি দেশের পারমাণবিক নিরাপত্তা শিখর সম্মেলনের পরিচালনার দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই বর্তেছে ওবামার ওপর। তাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-কেও যোগদান করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। কূটনৈতিক মহলের ধারণা এপ্রিলে ওবামা বাজিয়ে দেখে নিতে চাইছেন মনমোহনকে। এরপর ডিসেম্বরে কোপ মারার ব্যবস্থা করবেন। বলা বাহুল্য, কোপের 'ঘা'-টা খেতে হবে ভারতকেই। কারণ '৯/১১'-এর যাবতীয় সম্ভাবনাকে নির্মূল করার জন্য পাকিস্তানকে তোয়াজ ওবামাকে করতেই হবে।

শকুনের মৃত্যু

শকুনের মৃত্যু মানব হৃদয়কে ব্যথিত করেছে—এমন অভিধান-বহির্ভূত মন্তব্য ভূ-ভারতে যে কেউ কখনও শোনেননি, তা হলফ করেই বলা যায়। কিন্তু গত ১৯ ফেব্রুয়ারি উত্তরপ্রদেশের মহারাজগঞ্জ জেলায় যা ঘটল, তা সত্যিই মর্মান্তিক। একটা দ্রুতগতির ট্রেনের সামনে পড়ে মারা গেল ৩০টি শকুনের একটি দল। শকুনগুলির বিশেষত্ব এদের পিঠের রং দুধ-সাদা। জীব-বিজ্ঞানের পরিভাষায় এদের 'বিশেষ-প্রজাতি' হিসেবে গণ্য করা হয়। সবচেয়ে দুঃখের কথা, বন-আধিকারিক বলছেন—এই প্রজাতির শকুনের দল বিগত দশ বছরে চোখে পড়েনি।

টালবাহানা চলছেই

যে পরীক্ষার দিকে বছরভর হাপিত্যেশ করে চেয়ে থাকেন ভবিষ্যতের ম্যানেজমেন্ট কৃতীরা, সেই ক্যাট (কমন অ্যাডমিশন টেস্ট) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ নিয়ে টালবাহানা চলছেই। প্রসঙ্গত, এবারই আচমকা ক্যাট পরীক্ষাকে সর্বাধুনিক করার প্রচেষ্টায় 'অনলাইন' পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ চালু হয়েছিল। আর তারপরেই শুরু হয়েছে যত রাজ্যের বিপত্তি। প্রথমত, কোথাও অনলাইন খুলল, তো কোথাও খুলল না। এইভাবে বহুকষ্টে পরীক্ষা গ্রহণের পর ফলাফল প্রকাশেও এখন বিভ্রাট। ফল প্রকাশের দিন দু'বার পেছোনোর পর ঠিক হয়েছে ফেব্রুয়ারির শেষে সেটা বেরোবে। বেরোনোর পর ভগবান না করুন, রেজাল্টে আবার গণ্ডগোল না ধরা পড়ে!

এস-গার্ড

জেহাদী হামলার প্রভাব পড়ল এবার গাড়ি শিল্পেও। বিখ্যাত গাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থা মার্সিডিজ বেঞ্চ বাজারে নিয়ে এল বুলেট-প্রুফ নতুন গাড়ি এস-গার্ড। তবে এই গাড়িটি মধ্যবিত্ত তো দূরের কথা, উচ্চমধ্যবিত্তেরও নাগালের বাইরে। কারণ এর দাম ৬ কোটি টাকা। কোম্পানীর এক আধিকারিক খাড়লাস্কার দাবী করেছেন, গাড়ীটি ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সাঁজোয়া গাড়ির থেকে কোনও অংশে কম নয়। সেই অধিকারিকেরই দাবী, বড় মাপের রাজনীতিবিদ, খেলোয়াড় এবং সেলিব্রিটিদের কাছে গাড়িটি অপরিহার্য হয়ে উঠবে ভবিষ্যতে। সুতরাং জীবনের মূল্য খালি এঁদেরই আছে, সাধারণ মানুষের নেই। কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্লিপ্ততার কারণে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাটাই এখন সবচেয়ে বেশি জরুরি। কারণ নিরাপত্তা কেনার ক্ষমতা তাদের নেই।

অজস্র ২৬/১১

'একটি ২৬/১১ (মুম্বই হামলা) যথেষ্ট নয়। আরও অনেক ২৬/১১ ঘটানোর জন্য আমরা প্রস্তুত।' এমনই হুমকি দিলেন লস্কর-এ-তৈবার প্রধান হাফিজ সঈদ। আর এই হুমকিটা এল গত ২৩ ফেব্রুয়ারি। যার পরেরদিনই শুরু হবে ভারত ও পাকিস্তান বিদেশ সচিব পর্যায়ের বৈঠক। সঈদের হুমকি একটা জিনিস পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে, ভারত যতই আগবাড়িয়ে আলোচনা করতে চাক পাকিস্তানের সঙ্গে, পাক-সেনাবাহিনী কিন্তু শান্তি বিঘ্নিত করতে তার সর্বময় প্রচেষ্টা অব্যাহতই রাখবে। যে কারণেই পাক-সেনাবাহিনীর অন্তরঙ্গ বন্ধু সঈদের এহেন হুমকি-প্রদর্শন।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

লাগামহীন দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির পিছনে কাহারা ?

কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন ইউপিএ জোট দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় আসীন হইবার পর হইতেই নিত্য-ব্যবহার্য্য পণ্য-দ্রব্যের মূল্য লাফাইয়া লাফাইয়া বাড়িয়া চলিতেছে। এই মূল্যবৃদ্ধি রোধ করিবার কোনও সৎ-প্রচেষ্টা যেন কেন্দ্র বা রাজ্য কোনও সরকারেরই নাই। এ রাজ্যের বিরোধী পার্টি তৃণমূলের তো নাই-ই; অন্য দলগুলিরই বা আগ্রহ কোথায় ? কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলির যেন ছুঁচো গিলিবার মতো অবস্থা হইয়াছে। না পারিতেছে গিলিতে, না পারিতেছে উগরাইতে। কিন্তু দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কিছু বিবৃতি না দিলেও নহে ! তাই মাঝে মাঝে বিবৃতির হুংকার দেওয়া হইতেছে। বামপন্থীদের সেই ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলনের ধারাবাহিকতা কই ? আসিবেই বা কি করিয়া ? তাহারা যে আজ শাসক। শাসকের ভোগ দখলে অভ্যস্ত হইয়া তাহারা ৩২-৩৩ বছর ধরিয়া যে অন্যায় অবিচার জনগণের সঙ্গে করিয়াছে, তাহার ফলে জনগণের কাছে তাহাদের গ্রহণযোগ্যতা আজ তিলমাত্রও অবশিষ্ট নাই। কথায় বলে 'আপনি আচরি ধর্ম, অপরে শিখাও'। স্বচ্ছ ভাবমূর্তি সম্পন্ন মানুষ বা দল যাহা বলে মানুষ তাহাই বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লয়। কিন্তু শঠ্, অসৎ কালিমালিপ্ত হইয়াছে যাহার ভাবমূর্তি, তিনি ভাল কথা বলিলেও মানুষ তাহা গ্রহণ করিতে চাহে না। সন্দেহ করে।

একমাত্র বিজেপি দাবী করিতেই পারে যে তাহাদের সরকারের আমলে কার্গিল-যুদ্ধ, গুজরাতের ভূমিকম্প, বন্যা ইত্যাদি হওয়া সত্ত্বেও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সামান্যতমও হয় নাই। বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানি করিতেও হয় নাই; বরং ওই সময়ে রপ্তানীর উপরেই বেশী জোর দেওয়া হইয়াছিল। ফলে সরকারী কোষাগারে যেমন ছিল ভরপুর অর্থ; খাদ্য-ভাণ্ডারও ছিল উদ্বৃত্তে ভরপুর। অথচ বিজেপি-নেতৃত্বাধীন এন.ডি.এ সরকারের আমলেই কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের পঞ্চম বেতন কমিশনের নতুন বেতনক্রম চালু হইয়াছিল। ৫০ শতাংশ মহার্ঘ্যভাতা মূল বেতনের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছিল এই এন.ডি.এ সরকারই। কলকাতাবাসী কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের গৃহভাড়া ভাতা এক লাফে ১৫ শতাংশ হইতে ৩০ শতাংশ হইয়াছিল এই বাজপেয়ী সরকারের আমলেই। তাহা সত্ত্বেও এই সরকার বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ পুরোপুরি মিটাইয়া দিয়াছিল; আই.এম. এফ-এর নিকট কোনও ঋণগ্রহণও করে নাই। এ সমস্ত বাজপেয়ী সরকার করিয়াছিল দেশের মানুষকে সস্তা দরে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করিয়াই।

কংগ্রেস সরকার তাহা পারিতেছেনা কেন ? কারণ কংগ্রেস দলের নেতা-নেত্রীদের দেশাত্মবোধের অভাব। সে দলের শীর্ষে বসিয়া আছেন একজন বিদেশিনী, সেই দলের পক্ষে দেশাত্মবোধক আচরণ করা কোনওভাবেই সম্ভব নহে। আজ তাহাই হইতেছে। WTO'-র সম্মেলনে ব্যাপক প্রতিরোধের মুখে পড়িয়া আমেরিকা ও ইউরোপীয় বণিকরা WTO'-র বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি করিতে অসফল হইয়াছিল। এখন তাহারা এই বিদেশিনীর দ্বারা চালিত সরকারের সাহায্য লইয়া ভারতের বাজারে দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্যের চুক্তির মাধ্যমে ঢুকিয়া পড়িতেছে। গত আগস্ট হইতে একের পর এক দেশের সঙ্গে এই মুক্তবাণিজ্য চুক্তি (Free Trade Agreement) স্বাক্ষর করিয়া চলিয়াছে কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ সরকার। বিনা আমদানী শুল্কে তাহারা তাহাদের পণ্যদ্রব্যে আমাদিগের বাজার ভরিয়া তুলিতেছে। তাহাদের সরকার কৃষিতে ব্যাপক ভর্তুকি দেওয়ায় কম দামে তাহারা আমাদের বাজারে তাহাদের পণ্য প্রবেশ করাইতেছে, অন্যদিকে সরকারের অবহেলায় আমাদিগের কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য বাজার হইতে হটিয়া যাইতেছে।

কিন্তু মুশকিল হইতেছে বিদেশী বণিকদের একটি জায়গায়। সেইটি হইল ভারতীয় low-cost-economy. সস্তা-গণ্ডার বাজার, দুনিয়ার সবচেয়ে সস্তাগণ্ডার অর্থনীতি ছিল এই ভারত। এত সস্তা দরে পণ্য বিক্রয় করিয়া বিদেশীরা বেশিদিন টিঁকিতে পারিবে না। তাই প্রয়োজন এদেশের অর্থনীতিকে High-cost-Economy-তে পর্যবসিত করা। যেমন বার্ড-ফ্লুর প্রচার করিয়া করিয়া আমাদের মুরগীর মাংসের বাজারকে তুলিয়া দিয়াছে ৩০-৪০ টাকা হইতে ১৫০-১৬০ টাকায়। ইহা কি আমেরিকার কেন্টাকী কোম্পানীর দামী মুরগীর মাংস বিক্রয়কে ভারতের বাজারে সহজলভ্য করিয়া তুলিবারই চক্রান্তমাত্র ? ঠিক তেমনি ষড়যন্ত্র চলিতেছে সমস্ত পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রেও। তাই কি কেন্দ্র, কি রাজ্য—কোনও সরকারেরই কোনও সদিচ্ছা নাই এই দ্রব্যমূল্যরোধে। তাই নয় কী ?

জাতীয়জাগরণেরমন্ত্র

"যে আপনাকে পর করে, সে পরকে আপন করে না। যে আপন ঘরকে অস্বীকার করে, কখনওই বিশ্ব তাহার ঘরে আতিথ্য করিতে আসে না। নিজের পদ রক্ষার স্থানটুকুকে পরিত্যাগ করার দ্বারাই যে চরাচরের বিরাট ক্ষেত্রেকে অধিকার করা যায় একথা কখনওই শ্রদ্ধেয় হতে পারে না।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আইন-শৃঙ্খলার এই বেহাল দশাতেও কি পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা যায় না ?

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

পশ্চিমবঙ্গের এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সংবিধানের ৩৫৬ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি-শাসন জারি করা উচিত কিনা, এই প্রশ্নটা নিয়ে একটা জটিল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বহু বিরোধী-নেতা-নেত্রী তো বটেই, অনেক শ্রদ্ধেয় বুদ্ধিজীবীও মনে করেন, সরকার দীর্ঘদিন ধরে যে স্বৈরাচারী শাসন চালাচ্ছে তার প্রতিকারের জন্য অবিলম্বে এই ধরনের কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের দরকার আছে। আর শাসকদলের নেতারা স্বাভাবিকভাবেই তারস্বরে বলে চলেছেন—সব ঠিক আছে, সুতরাং রাষ্ট্রপতি-শাসন জারি করা হলে গণতন্ত্র হত্যা ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ধবংসের দায়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে মারাত্মক ফল ভোগ করতেই হবে।

এই পরিস্থিতিতে বিষয়টা নিয়ে একটু আলোচনা করা দরকার। আমাদের সংবিধানে তিন ধরনের জরুরী অবস্থার কথা বলা হয়েছে—তার অন্যতম হলো সাংবিধানিক জরুরী অবস্থা (৩৫৬ নং অনুচ্ছেদ)। এতে বলা হয়েছে—রাজ্যপালের রিপোর্টের ভিত্তিতে বা অন্য কোনওভাবে যদি রাষ্ট্রপতির

সংসদীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান সাধারণত ক্যাবিনেটের পরামর্শেই চলেন। সেইজন্য গণপরিষদে কেউ কেউ বলেছিলেন—রাজনৈতিক স্বার্থে ক্যাবিনেট রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে এই ক্ষমতার ব্যবস্থা করতে পারে। বিশেষ করে, ভিন্ন দলের রাজ্য-সরকারের এই অস্ত্র প্রয়োগ করা হবে—তাতে কিন্তু ধবংস হবে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ।

কিন্তু ডঃ আম্বেদকর সেইসব সমালোচকদের আশ্বস্ত করে বলেছিলেন যে, রাজ্য-সরকারকে কেন্দ্রের হাতের পুতুলে পরিণত করাটা সংবিধানের উদ্দেশ্য নয়। তিনি স্পষ্ট করে বলেছিলেন, এই ধরণের কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ ঘটবে রাজ্য-সরকার সাংবিধানিক পদ্ধতিতে শাসন চালাতে ব্যর্থ হলেই [illegible]। তাঁর আরও আশ্বাস ছিল—এই ক্ষমতা প্রয়োগের আগে রাষ্ট্রপতি রাজ্য সরকারকে সতর্ক করবেন এবং ত্রুটি

প্রবন্ধে ('আর্টিক্‌ল ৩৫৬ অফ দ্য কন্‌স্টিটিউশন', ইউনিয়ান স্টেট্ রিলেশান) জানিয়েছেন—এক্ষেত্রে কোনও ন্যায়নীতি বা নিয়মকে অনুসরণ করা হয়নি। সব চেয়ে বেশি সরব কংগ্রেসই কেন্দ্রে ক্ষমতায় ছিল—তার রাজনৈতিক স্বার্থেই এই অনুচ্ছেদটা কাজে লাগানো হয়েছে। ডঃ শ্রীরাম মহেশ্বরীও মন্তব্য করেছেন যে, এই ব্যাপারে কোনও নিয়ম, নীতি বা মাপকাঠি কখনও তৈরি করা হয়নি—এই অস্ত্রকে ভিন্নধর্মী রাজ্য-সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে।

তবে দোষটা শুধু কংগ্রেসের নয়। দেখা যাচ্ছে—কেন্দ্রে যে ধরনের সরকারই বসুক না কেন, ৩৫৬ নং অনুচ্ছেদটার অপব্যবহারের ব্যাপারে কেউই অনীহা দেখায়নি। ১৯৭৭ সালে জনতা-সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসেই কংগ্রেস-শাসিত নয়টা রাজ্যের সরকারকে সরিয়ে দিয়েছিল এই অস্ত্রের সাহায্যে এবং তাতে মদত দিয়েছিল বামপন্থীরাও। ডঃ অনুপচাঁদ কাপুরের মতে, ওই রাজ্যগুলো ছিল ৩৫৬নং অনুচ্ছেদের

"প্যারোলে ৩২ বছর অসামীরা মুক্ত থাকতে পারে ? ২৭ বছর জামিন-অযোগ্য পরোয়ানা নিয়ে মন্ত্রীত্ব করা চলে ? স্বাভাবিক অবস্থা থাকলে অপরাধী 'রামবাবু' পরে 'শ্যামবাবু' সেজে নেতা হতে পারে ? এর পরেও ৩৫৬ নং অনুচ্ছেদকে কাজে লাগানো যায় না ? তাহলে এটাকে সংবিধানে রাখার দরকার কি ?"

মনে হয় যে, কোনও রাজ্যে সাংবিধানিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, তাহলে তিনি সংশ্লিষ্ট রাজ্য-সরকারকে পদচ্যুত করে সাময়িক কালের জন্য সেই রাজ্যের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নিতে পারেন।

এটা লক্ষণীয় যে, এই অনুচ্ছেদে বা অন্য কোথাও সংবিধান ভেঙে পড়া বলতে কি বোঝায়, সেটা স্পষ্ট করে বলা হয়নি—গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টিকে, কারণ এক্ষেত্রে '[illegible]' কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপালের মতামতকে তেমন স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। খসড়া-সংবিধানে অবশ্য ছিল—এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যপালের প্রতিবেদনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। কিন্তু খসড়া-কমিটির সভাপতি ডঃ বি. আর. আম্বেদকর '[illegible]' শব্দদুটো পরে যুক্ত করেছেন এবং সংশোধিত সংবিধানে সেটাই গৃহীত হয়েছে। সুতরাং বলা যায়—কোনও রাজ্যে সাংবিধানিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে কিংবা, সেটা রাজ্যপালের রিপোর্ট ছাড়াও রাষ্ট্রপতি তাঁর নিজস্ব সূত্রে জেনে নিতে পারেন এবং তার ভিত্তিতেই তাঁর এই জরুরী ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। ডঃ বি. সি. রাউত মনে করেন, এক্ষেত্রে রাজ্যপালের মতামত এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতা অবশ্যই রাষ্ট্রপতির আছে (ডেমোক্রেটিক কন্‌স্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া পৃ. ১২১)।

সংশোধনের সুযোগ দেবেন।

কিন্তু তাঁর আশ্বাস ও বিশ্বাসের মধ্যে একটা ফাঁক থেকে গেছে। সাংবিধানিক কাঠামো ভেঙে পড়া কাকে বলে—সেটা স্পষ্ট করা হয়নি—তাঁর ভাষণেও না, নালিখিত অনুচ্ছেদটাতেও না। আর 'সন্তুষ্টি' কথাটার উপর জোর দেওয়ার ফলে এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির হাতে ব্যাপক ক্ষমতা রূপে তা দেওয়া হয়েছে। সেইজন্য প্রাক্তন অ্যাটর্নী জেনারেল এম. সি. শীতলবাদ মন্তব্য করেছেন, প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত সন্তুষ্টিকে—সেটা ক্যাবিনেটের ইচ্ছে দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে (দ্য ইন্ডিয়ান কন্‌স্টিটিউশান, পৃ. ১৭)। এভাবে প্রখ্যাত আইনজ্ঞ এইচ. এম. সারাভাই জানিয়েছেন, চলমান ঘটনাকে ভিত্তি করে রাষ্ট্রপতি তাঁর সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, কোন্ পরিস্থিতিতে তিনি ৩৫৬ নং অনুচ্ছেদ ব্যবহার করবেন—সেটা আগাম বলা সম্ভব নয় (কন্‌স্টিউশনাল অফ্ ইন্ডিয়া, প. ৯৭)।

সেই কারণেই এই কেন্দ্রীয় অস্ত্রটা ইতিমধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে নির্বিচারে। ১৯৯৬ সালে, লোকসভা প্রকাশিত 'প্রেসিডেন্ট'স্ রুল ইন্ দ্য স্টেট্‌স' গ্রন্থে জানানো হয়েছে—১৯৫০ সাল থেকে ৯৩ বার এভাবে রাষ্ট্রপতি-শাসন জারি করা হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। আরও বড় কথা হলো—এই ব্যাপারে প্রাধান্য পেয়েছে রাজনৈতিক স্বার্থবোধ। এস. আর. নাকাতে তাঁর বিখ্যাত

সাম্প্রতিক বলি [illegible]—ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সিস্টেম, পৃঃ ১৯১)। ডঃ জে. সি. জোহারীও জানিয়েছেন—৩৫৬ নং অনুচ্ছেদের জঘন্যতম নজির [illegible] হলো ১৯৭৭ সালে নয়টা কংগ্রেস-শাসিত রাজ্য সরকারের ক্ষমতাচ্যুতি (ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃঃ ৫৯৪)। সংক্ষেপে বলা যায়—রাষ্ট্রপতি-শাসন জারি শুরু করা হয়েছিল প্রায় সংবিধানের কালি শুকানোর স ে ঙ্গ সঙ্গেই—কিন্তু তার সঙ্গত কারণ ঘটেছে কদাচিৎ। এই কারণে ডঃ এস. এন. সিক্রি মন্তব্য করেছেন—এই ক্ষমতাটা, [illegible]—(ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টঅ্যান্ড পলিটিক্স, পৃঃ ৯৮)।

তাৎপর্যের বিষয় হল—প্রথম দিকে আমাদের সুপ্রীম কোর্ট এই ব্যাপারে একটা নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সেই জন্য যখন ১৯৭৭ সালে বিশ্রীভাবে একসঙ্গে নয়টা রাজ্যকে কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে আনা হয়েছিল ৩৫৬ নং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে, তখনও সুপ্রীম কোর্ট সেই স্বৈরাচারকে বৈধ বলে রায় দিয়েছিল (রাজস্থান বনাম কেন্দ্র)। বিচারপতি বেগ মন্তব্য করেছিলেন—অনুচ্ছেদটার জঘন্যতম অপব্যবহার না হলে আদালতের কিছু করার নেই। পৃথক রায়ে বিচারপতি ফজল আলীও প্রায় অনুরূপ অভিমত প্রকাশ

(এরপর ১৪ পাতায়)

কেন এই সর্বনাশা পদক্ষেপ

(১ পাতার পর)

নোয়াখালিতে এক তরফা হিন্দু নিধন ঘটিয়ে ভারতকে কেটে দু'ভাগ করেছিলেন। অসহায় গান্ধীজী হতভম্ব হয়ে ঢোক গিলে বললেন, এটা বিভাজন নয়, এ হচ্ছে ভাই-এ ভাই-এ আলাদা হয়ে বসবাস করা।

জন্মলগ্ন থেকে মুসলিম ধর্মশাস্ত্র মেনেই ধর্মনিরপেক্ষতা বিসর্জন দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি মুসলিম আদর্শে পরিচালিত হতে থাকে। পক্ষান্তরে ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে শুরু হয় 'মুসলিম তোষণ'। যত দিন যেতে থাকে তত বেশি বেশি করে মুসলিম তোষণ করা শুরু হয়। কার্যত আত্মহত্যার প্রতিযোগিতা শুরু করেন আমাদের সেকুলারবাদীরা। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সাচার কমিটি এবং রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের রিপোর্টকে অছিলা করে অতি সম্প্রতি 'মুসলমানদের সংরক্ষণ' নামক ভারতের মৃত্যুবাণ মৌলবাদীদের হাতে তুলে দেবার প্রস্তুতি নিয়েছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার। এ ব্যাপারে পৃথিবীর একাদশ আশ্চর্য দেখালেন বামপন্থীরা। তাদের কাছে ইসলাম ধর্ম আজ আর 'আফিম' নয়, 'অমৃত'।

কলকাতার চরমতম এক সাম্প্রদায়িক ইমাম সাহেব প্রকাশ্য দিবালোকে টি-ভি চ্যানেলে বলেছিলেন, আপনারা আমাদের মুসলমানদের উপর 'ইনজাস্টিস্' করছেন। এই 'ইনজাস্টিস্' বন্ধ না হলে আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করব। 'জেহাদ' আমাদের ধর্মীয় অঙ্গ। ইনজাস্টিসের এই ঘৃণ্য অসত্যকে মেনে নেওয়া হচ্ছে ভোটের স্বার্থে, না জেহাদের ভয়ে, না দু'টোর জন্যই? কোথায় ভারতবাসীর দুর্বলতা? তা ছাড়া গত ৩২ বছর ধরে বাংলার মহাশক্তিধর শাসন-কর্তা হয়েও বামফ্রন্ট মুসলমানদের প্রতি 'জাস্টিস্' দেখাতে পারলেন না?

সরকারিভাবে ঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে যারা ধর্মের ভিত্তিতে মুসলমানদের সংরক্ষণ মেনে নিয়ে আজ যে ঐতিহাসিক ভুলটি করতে যাচ্ছেন তারা এর পরিণতির কথা কি একবারও ভেবে দেখেছেন? কাল 'আলিগড়-দেওবন্দী, শাহী-অশাহী, ইমাম-নন-ইমামদের' সঙ্গে নিয়ে মুসলিম মৌলবাদীরা শতগুণ শক্তি নিয়ে দাবির পর দাবি তুলবে এবং মার্কসবাদের মুখোশ পরিহিত মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লার ভাষায় বলবে, 'কোন সমীক্ষা-টমীক্ষা নয় এক্ষুণি আমাদের দাবিগুলি মেনে নিতে হবে।' এই রেজ্জাক সাহেবকে উদ্ধৃত করেই বলবে, আমরা এখন ফুটবলার হয়েছি। এখন তোদের নিয়ে 'বল' খেলবো।

ইতিহাস বলছে, ভারতকে অখণ্ড রাখার অন্যতম শর্ত হিসেবে মি. মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ সেদিন প্রতিরক্ষাসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে শতকরা ৫০ ভাগ সংরক্ষণ চেয়েছিলেন। এই দাবির সমালোচনা করতে গিয়ে মহান ভারত-প্রেমিক ডঃ বি. আর. আম্বেদকর তাঁর কালজয়ী সৃষ্টি 'পাকিস্তান অর দি পার্টিশন অব ইন্ডিয়া' বলেছেন, "The Muslims are now speaking the language of Hitler and claimimg a place in the sun as Hitler had been doing for Germany." অর্থাৎ মুসলমানরা এখন হিটলারের ভাষায় কথা বলছেন এবং সূর্যের মধ্যে একটি জায়গা চান ঠিক যেমনটি হিটলার চেয়েছিলেন তার জার্মানীর জন্য। (অধ্যায়-১১, পৃ-২৬৪)

গত ৩০ ডিসেম্বর, ২০০৯ তারিখে উত্তর ২৪ পরগণার একটি সভায় মৌলবাদী মুসলিমদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে ফরয়ার্ড ব্লক নেতা কমরেড হরিপদ বিশ্বাসও এ পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে চলে আসা মুসলমানদেরও ভারতের নাগরিকত্ব দাবি করেছেন। তারা ভুলে গেছেন, পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশের মৌলবাদী অপশক্তি দ্বারা নিগৃহীত হয়ে প্রাণ ও মা-বোনদের ইজ্জত বাঁচাবার জন্যই হিন্দু-বৌদ্ধ-আদিবাসীরা ভারতে এসেছেন। আর মুসলমানদের একটি বড় অংশ এসেছেন অশুভ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে। সামান্য কিছু সংখ্যক হয়ত আসছেন অর্থনৈতিক কারণে। এদেরকে নির্বিবাদে নাগরিকত্ব দেবার সুপারিশ করা স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করার সামিল।

১৯৭৬ থেকে আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অফিসে গিয়ে ভারতে বাঙালি উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব এবং পুনর্বাসনের দাবির প্রতি সমর্থন জানাবার অনুরোধ জানিয়ে আসছি। কিন্তু তাঁরা কেউ আমাদের বক্তব্য শুনেও শুনছেন না। বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত চুরি, ডাকাতি, অপমানজনক গালাগাল এবং নারী ধর্ষণের হাত থেকে বাঁচবার জন্য যারা পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে এখানে এসেছেন এবং এখনও আসছেন। গত ৩৫ বছরের মধ্যে তাদের পক্ষে একটি কথাও বলেননি বামপন্থীরা। বরং বামপন্থীরা ১৯৭৯-এ মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তু নিধন যজ্ঞ ঘটিয়ে সভ্যতায় কলঙ্ক লেপন করেছেন।

আজ ধর্মের ভিত্তিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমানদের সংরক্ষণ মেনে নেবার সহজ সরল অর্থ হবে, দু'দিন বাদে এদের সেনাবাহিনীতে সংরক্ষণ দেওয়া। সেনাবাহিনীতে এদের উপস্থিতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে তা ব্যাখ্যা করে বলে গেছেন ডঃ বি. আর. আম্বেদকর পূর্বোক্ত 'পাকিস্তান অর দি পার্টিশন অব ইন্ডিয়ায়'। তিনি বলেছেন, "কোনও দেশের স্বাধীনতা রক্ষার নিশ্চিত গ্যারান্টি হচ্ছে একটি নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য সেনাবাহিনী, যাদের উপর আমরা এই মর্মে আস্থা রাখতে পারি যে তারা যে কোনও পরিস্থিতিতে যে কোন সময় দেশের জন্য যুদ্ধ করবে।...ভারত যদি বিদেশী শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন কি মুসলমান সেনাদের বিশ্বাস করা যাবে?...দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিষ যদি মুসলমান সৈনিকদের দেহে সংক্রমিত হয়, তাহলে ভারতীয় সৈন্য নিরাপদ থাকতে পারবে না। এই (আক্রান্ত) সেনাবাহিনী ভারতের স্বাধীনতার রক্ষক না হয়ে স্বাধীনতার বিপক্ষে একটি অভিশাপ ও পরাক্রমশালী বিপদ হিসেবে কাজ করতে থাকবে।"

আজ ধর্মের ভিত্তিতে মুসলমানদের সংরক্ষণ দেওয়ার অর্থ কাল সমগ্র ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনাকে ডেকে আনা। এ ব্যাপারেও ডঃ আম্বেদকর আমাদের সাবধান করে গেছেন।

পরিশেষে বলছি, আজ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণের যে দাবি তোলা হচ্ছে তা অযৌক্তিক এবং নগ্ন মুসলিম তোষণ ছাড়া কিছুই নয়। পৃথিবীতে কেউ কোনও দিন অযৌক্তিকভাবে তোষণ করে সফল হতে পারেনি। কারণ, তোষণ করলে প্রতিপক্ষের দাবির বহর বাড়তেই থাকে। ["Appeasement sets no limits to the demands and aspirations of the aggressors."–Dr. Ambedkar, Ibid, p-270, Chapter-XI]

দেশপ্রেমিক ভারতবাসীর কাছে বিনীত অনুরোধ, আসুন সবাই মিলে সমস্বরে আওয়াজ তুলি, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে কোনও ক্রমেই একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়কে সংরক্ষণ দেওয়া চলবে না। ও-বি-সি তালিকায় তো গরীব মুসলমানদের নাম আছে। সেটাই যথেষ্ট। এ ছাড়া বাংলাদেশ থেকে যে সব মুসলমান আসছে কালবিলম্ব না করে তাদেরকে বহিষ্কার করা হোক।

জেহাদী প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কর্মসংস্থান

(১ পাতার পর)

রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা অরুণ জেটলি বলতে বাধ্য হয়েছেন, কাশ্মীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে ভারত। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব জি কে পিল্লাই জানিয়েছেন—মার্চ মাসের শেষ নাগাদ এই ব্যাপারে যাবতীয় ব্লু-প্রিন্ট তৈরি হয়ে যাবে। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ে মিলেই এই ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করবে। সংশ্লিষ্ট এই 'পলিসি'র ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে প্রাক্তন আই বি প্রধান এ কে দোভাল বলেছেন—'যেহেতু বিষয়টা স্পর্শকাতর, তাই সরকারের উচিত নয় এই বিষয়ে তাড়াহুড়ো করা। সবচাইতে বড় কথা পাক-কাশ্মীরের যুবকরা যখন এতে রাজি হয়ে গিয়েছে, তখন বুঝতে হবে তারা আবেগের বশবর্তী হয়ে একটা সময় কোনও 'আদর্শে' উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। সরকারের অবশ্যই উচিত, কেন তারা ফিরতে চাইছে এই বিষয়টা ভালভাবে যাচাই করে নেওয়া। সঠিক কারণ ছাড়া তাদের ফেরালে হিতে বিপরীত হবে।" স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ২০০৮-এ কমপক্ষে ২০ জন ভারতে এসেছিলেন পাক-কাশ্মীর থেকে, ২০০৯-এ এই সংখ্যাটা গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় ৬৩টিতে, এবং এবছর এখনও অবধি তিনজন ভারতে এসেছেন। আরও একটা ব্যাপার, গত দু'বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে জম্মু-কাশ্মীর থেকে সেনা প্রত্যাহারের ধুম পড়ে গিয়েছে। দুই ডিভিশন মানে ৩০,০০০ সৈন্য ফেরানো হয়েছে সেখান থেকে। দু' ব্যাটেলিয়ান অর্থাৎ ৮০০০ মানুষের কেন্দ্রীয় বাহিনীকেও ইদানীংকালের বছর দু'য়েকের মধ্যে প্রত্যাহার করা হয়েছে জম্মু-কাশ্মীর থেকে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব সরকারের এই ধরনের কাজের সাফাই গাইতে গিয়ে বলেছেন—'আমরা সেনাবাহিনী বা কেন্দ্রীয় বাহিনীর তুলনায় স্থানীয় পুলিশের ওপরেই ভরসা করতে চাইছি। কারণ তারাই স্থানীয় মানুষের ভাব-ভঙ্গি, কথা-বার্তা এমনকী অপরাধ সম্পর্কেও অবহিত রয়েছেন'। কিন্তু তাই বলে জঙ্গী প্রশিক্ষণ নেওয়া যুবকদের নিরাপত্তাবাহিনীতে নিতে হবে? এমনিতেই নিরাপত্তার এই হাল, এরপর সর্ষের মধ্যে ভূত ঢুকলে কি হবে তা ভাবতেই শিহরিত হয়ে পড়ছেন জম্মু ও কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ। সবচেয়ে আতঙ্কের কথা, পিল্লাই মন্তব্য করে বসেছেন—জম্মু-কাশ্মীরে বিভিন্ন বৃহৎ নির্মাণ-সংস্থা ও শিল্প-এস্টেটগুলিতে ২০১০-এর জুনের মধ্যে বহু কর্মসংস্থান হবে এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী ও অন্যান্য জায়গায় ২০১১-এর মাঝামাঝির মধ্যে অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে এসব জায়গার পাক-অধিকৃত কাশ্মীরি জঙ্গিরা ঢুকলে ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে আর বিদেশী শক্তির দরকার হবে না, দেশী শত্রুই যথেষ্ট। মজার কথা, নেহরু মারাত্মক ভুল করে কাশ্মীরের একাংশ পাকিস্তানের হাতে তুলে দিয়ে যে বিষবৃক্ষ রোপন করেছিলেন, আজ তাঁরই রাজনৈতিক উত্তরসূরী পি চিদাম্বরম সেই ভুলের সংশোধন করতে গিয়ে আরও বড় ভুল করে দেশবাসীকে বিপন্ন করতে চলেছেন।

'রা' নেই কেন?

(১ পাতার পর)

৩৫। ওদের বাধা গ্রাহ্যই করি না।' সেই একই ব্যক্তি এখন বলছেন ওদের বাধার জন্য মাওবাদীদের দমন করা যাচ্ছে না। এ আমাদের কেমন মুখ্যমন্ত্রী?

পুণের বিস্ফোরণে কলকাতার চারজন তরুণ-তরুণী নিহত হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন, সমবেদনা জানিয়েছেন অথবা জেহাদি হামলার নিন্দা করেছেন বলে জানা নেই। করার কথাও নয়। কারণ, মুসলিম ভোট বড় বালাই। পার্টি রাজনীতি মুখ্যমন্ত্রীর মানবিকতাকেও খেয়ে নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর কী উচিৎ নয় মাওবাদীদের সঙ্গে জেহাদি সন্ত্রাসেরও সমান নিন্দা করা। কিন্তু তা তিনি করবেন না। কারণ, তিনি পার্টির মুখ্যমন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নন।

মন্দির ভাঙছে রাজ্য

(১ পাতার পর)

গাইডলাইন। সেই গাইড লাইন তৈরি হলেই মন্দির ভাঙতে নামবে সরকার। সবমিলিয়ে কয়েক হাজার মন্দির এর জন্য ভাঙতে হবে। হিন্দুরা সহিষ্ণু, তাই মন্দির ভাঙার এত উদ্যোগ সরকারের। অন্য ধর্মের ধর্মস্থানের ক্ষেত্রেও একই পথ নিতে পারবে তো সরকার?

রাজ্য রাজনীতি

বুদ্ধ দেবের পতন ত্বরান্বিত করল শিলদা

নিশাকর সোম

সালুয়া-শিলদা এই দুটো নামের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ মানুষ পরিচিত হয়ে গেছেন। এ ঘটনায় পূর্ব, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ার মানুষ আতঙ্কিত হয়েছেন। এমনকী কলকাতার মানুষদের মধ্যে নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র পুলিশবাহিনীর মধ্যেও নিরাশা-ভয়-আতঙ্ক। সেইসঙ্গে সরকারের প্রশাসনের প্রতি ঘৃণার সঞ্চার হয়েছে। ই-এফ-আর ক্যাম্পে মাও-হামলার নিরাপত্তাবাহিনীদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলার ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে। দেখা গেছে মদের বোতল। জানা গেছে যৌনকর্মীরা নিয়মিতভাবে ক্যাম্পে আসতেন। ক্যাম্পের পাশে সাধারণ শৌচালয়—প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র থাকায় জনসাধারণের অবাধ যাতায়াত ছিল। এ-সব কথা সবই পাঠকদের জানা, তবু সাজিয়ে দিলাম। কারণ অপারেশন গ্রিন হ্যান্ট-এর ঘোষণার পর কেন ই-এফ-আর-এর ক্যাম্পে এরকম অবস্থা? তাঁরা কি মনে করেছিলেন গ্রিন হ্যান্ট হবে আর মাওবাদী হত্যাকারীরা হাঁটুগেড়ে আত্মসমর্পণ করবে? এরকম ভেবে থাকলে মুর্খের স্বর্গে বাস করছিলেন।

সুশান্ত ঘোষ-দীপক সরকারের যুগল-বন্দির কথা আগের লেখাতেই বলা হয়েছিল। সম্প্রতি সিপিএম-এর রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলীতে 'অ্যাকশন'-এর জেনারেলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

তাঁদের আশ্বাসেই নাকি সমগ্র রাজ্যপুলিশের "মার দিয়া কেল্লা" মনোভাব এবং "আমাদের দায়িত্ব নেই" এই চিন্তা মাথায় ঢুকে গেছিলো। এর জবাব চাই।

এই ঘটনায় গাফিলতির জন্য দায়ী হচ্ছে—প্রথমত, ডি জি ভূপিন্দর সিং; দ্বিতীয়ত, ই এফ. আর-এর ইনচার্জ;তৃতীয়ত, রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগ;চতুর্থত, স্বরাষ্ট্রসচিব; পঞ্চমত, সমগ্র পুলিশ প্রশাসন।

মৌখিক গালাগালি দেওয়া ছাড়া মাওবাদীদের বিরুদ্ধে সিপিএমের সরকার কিছুই করেনি। সিপিএম বলেছিল তারা "রাজনৈতিকভাবে" মাওবাদীদের মোকাবিলা করবে। অ্যায়সা রাজনৈতিক মোকাবিলার খেল সিপিএম দল দেখানো যে তাতে মাওবাদীরাই সিপিএম-কে রাজনৈতিক ও অস্ত্রগতভাবে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রশ্ন হলো, ডিজি ভূপিন্দর সিং ঘটনা ঘটার পর দেখতে গেছেন— তিনি নিয়মিত মনিটারিং করতেন কি? গ্রিন হ্যান্টের অভিযান ঘোষণার পর নিজে কি কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন? কারণ তিনি কি মনে করেছিলেন—মাওবাদীরা ভয়ে চুপ করে থাকবে? ভূপিন্দর সিং শুধু "গাফিলতি"-র কথা বলেই পার পেয়ে যাচ্ছেন। দুই, ই এফ আর ইনচার্জ রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করায় তাঁকে শো-কজ করা হয়েছে। তিন, গোয়েন্দা বিভাগ-এর সোর্স নেই কেন? গোয়েন্দা বিভাগের কর্তারা কি পমেরয়-এর গেরিলা ওয়ার ফেয়ার/পার্টি জান ওয়ার ফেয়ার পড়াশোনা করেছেন? এর প্রয়োজনীয়তা কি অনুভব করেছেন? এক সময়ে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা-বিভাগের কর্তারা নকশালদের পুস্তক-পুস্তিকা-লিফলেট পড়ে রাজনৈতিকভাবে আপ টু ডেট হয়ে থাকতেন। শোনা যাচ্ছে, রাজ্য-গোয়েন্দারা নাকি সিপিএম-এর পার্টি-সোর্স-এর উপর নির্ভর করে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকেন। স্বরাষ্ট্রসচিব মহাশয় জবাব দেবেন কি তিনি ই-এফ-আর-এর এই অবস্থা এবং এমন প্রকাশ্য স্থানে পুলিশ ক্যাম্প করার কথা জানতেন? মাওবাদীদের বিরুদ্ধে গ্রিনহ্যান্টের মতোন এক ব্যাপক আক্রমণাত্মক অভিযানের আগে তিনি রাজ্যের নিরাপত্তা তথা মাওবাদী আক্রান্ত জেলাগুলির সম্বন্ধে কি কর্মপদ্ধতি এবং কর্মসূচী নিয়েছিলেন? তিনি কি তাঁর বক্তব্য রাজ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে জানিয়ে ছিলেন? লোকে তো বলেন স্বরাষ্ট্রসচিব "বুদ্ধবাবুর লোক", সব আমলারই কি সব সময়ে সব সরকারের আমলে কোনও না কোনও "বাবুর লোক" হবেন—কেউই কি রাজ্য প্রশাসনের অধীনস্থ হবেন না? দেশ তথা রাজ্যের স্বার্থ দেখবেন না? তাঁদের তো রাজ্যের সাধারণের করের টাকায় বেতন হয়।

সমগ্র পুলিশ-প্রশাসন তো স্থবির, ভীত সন্ত্রস্ত এবং গা ছাড়া ভাবে রয়েছে। এর জন্য দায়ী রাজ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বারবার এই কলামে লেখা হয়েছে বুদ্ধবাবুকে না সরানোর ইচ্ছা পার্টির নেই। কিন্তু স্বরাষ্ট্র দপ্তর বিশেষ করে পুলিশ প্রশাসন অন্য কারও হাতে দেওয়া উচিত। অবশ্যই কলসী হয়েছে ফুটো—জল আনবে কি করে?

প্রশাসনিক অযোগ্যতা এবং ব্যর্থতার রেকর্ড সৃষ্টি করা মুখ্যমন্ত্রীর হাতে নাকি গ্রামীণ বিদ্যুতের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে।

আর শহরাঞ্চলের বিদ্যুতের দায়িত্ব শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেনের হাতে থাকবে। ইনিও একজন বিতর্কিত মন্ত্রী নেতা। যাঁর কাজকর্ম পার্টিকে ডুবিয়ে দিতে সাহায্য করছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

প্রসঙ্গত সিপিএম-পরিচালিত সরকার আসার কয়েক বছরের মধ্যে স্পেশাল ব্রাঞ্চ এবং ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ -এর সোর্স-মানি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল পার্টি-সোর্স-এ "সব তথ্য" জানা যাবে। পুলিশ-বাহিনীকে আধুনিকীকরণ করার জন্য বাজেটে প্রচুর অর্থবরাদ্দ হয়েছে। মাও-দমন সম্বন্ধেও কেন্দ্রীয় "অর্থ সাহায্য" নাকি পাওয়া গেছিলো। এইসব অর্থে কি করা হলো? মান্ধাতা আমলের মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে অফিস-যাত্রীর টিফিন কৌটা ধরা যায় কিন্তু আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রকে এর আওতায় আনা যায় না। আসলে মাওবাদীদের সম্পর্কে খালি কথার বোমাবাজি ছাড়া সিপিএম নেতৃত্ব আর কিছুই করেনি। তাঁরা মাও-মমতা সম্পর্ক খুঁজে ব্যস্ত থাকছেন। যদিও সিপিএম তাদের বিরুদ্ধে বিদেশি চক্রান্তের কথা বলে চলেছিল। কিন্তু মনে রাখেনি প্রয়োজনে এই সব বিদেশি অস্ত্র সিপিএম-এর শত্রুদের হাতে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে? এছাড়া একাধিকবার পুলিশ স্টেশন থেকে অস্ত্রশস্ত্র লুঠ হয়েছে, বন্দুক লুঠ হয়েছে। প্রশাসনিক ব্যবস্থা কিছুই নেওয়া হয়নি।

বস্তুত মৌখিক গালাগালি দেওয়া ছাড়া মাওবাদীদের বিরুদ্ধে সিপিএমের সরকার কিছুই করেনি। সিপিএম বলেছিল তারা "রাজনৈতিকভাবে" মাওবাদীদের মোকাবিলা করবে। অ্যায়সা রাজনৈতিক মোকাবিলার খেল সিপিএম দল দেখালো যে তাতে মাওবাদীরাই সিপিএম-কে রাজনৈতিক ও অস্ত্রগতভাবে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছে। মাওবাদীরা কিভাবে গোকুলে বেড়ে উঠলো?—(১) সিপিএম কর্মী-নেতা-মন্ত্রীরা ধনী-বণিকদের সঙ্গে যখন কোলাকুলি করতে ব্যস্ত তখন মাওবাদীরা গরীব আদিবাসীদের উন্নয়নের কথা বলে চিত্তজয় করতে চেষ্টা করে। (২) মাও-সে-তুং-এর তত্ত্ব—"শত্রুর শত্রু আমার মিত্র"—প্রয়োগ করে তৃণমূল দলে এবং তৃণমূলের অবস্থান এবং সিপিএম বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে তৃণমূলের অন্যতম মস্তিষ্কের মনিটারিং করতে সক্ষম হল।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার, দরিদ্র-দলিত মানুষদের আর্থিক উন্নয়নের এবং রাজ্যের ক্রমবর্ধমান বেকার যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করা হলে—অদূর ভবিষ্যতে গোটা রাজ্যেই "মাওবাদী" শক্তি বেড়ে যাবেই।

অন্য রকম

সাঁঝা চুলা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বাঙালী ভোজন রসিক এবং বাঙালীদের খাদ্য তালিকায় মাছ, ভাত, মাংস এগুলি চাই-ই। খাদ্যগুলিকে সুস্বাদু করে তোলার দায়িত্ব থাকে ঘরের গৃহিনীদের উপর। রোজকার মতন নানান কাজ সেরে হেঁসেলে তাদেরকে ঢুকতেই হয়। কারণ দুপুরে ভাত কিংবা মাছের ঝোল কিংবা রাতের রুটি দেওয়ার দায়িত্ব তাদের উপরেই থাকে। কেবল বাংলায় কেন সারা দেশেই পরিবারের আহারের ব্যবস্থার জন্য হেঁসেলে তাদেরকে ঢুকতেই হয়। এই রীতি বহু আগে থেকে প্রচলিত।

সাঁঝা চুলায় রুটি তৈরিতে ব্যস্ত মহিলারা।

তবে বর্তমানে পাঞ্জাবের ফাজিলকা শহরের মহিলাদের চিত্রটি একটু ভিন্ন ধরনের। তারা আহার তৈরির জন্য রুটি তৈরী করেন। কিন্তু সেটি ঘরের ভিতরে নয়, ঘরের বাইরে এবং এই প্রক্রিয়াটির নাম দেওয়া হয়েছে "সাঁঝা চুলা"। পাড়ার সমস্ত প্রতিবেশী একসঙ্গে মিলিত হয়ে গল্পগুজব করতে করতে তাদের প্রধান খাদ্য রুটি এই "সাঁঝা চুলায়" তৈরি করেন। এবং গরম রুটি তাদের ঘরে নিয়ে যান। এই "সাঁঝা চুলা" পাঞ্জাবী লোক সংস্কৃতির এক প্রধান অঙ্গ। যার প্রথম সূচনা করেছিলেন শিখ ধর্মগুরু গুরুনানক দেব। যা এখন শিখ সম্প্রদায়ের কাছে লঙ্গর নামে পরিচিত।

ফাজিলকার মহিলাদের মতে এই "সাঁঝা চুলা" তাদেরকে পরিবেশের অনেক কাছে টেনে এনেছে। কারণ ঘরের দম বন্ধ করা পরিবেশ থেকে বেরিয়ে মুক্ত আকাশ ও মুক্ত বাতাসের মধ্যে তারা নিঃশ্বাস নিতে পারছেন। এবং প্রতিবেশী ও পরিজনদের মধ্যে একসঙ্গে বসে গল্পগুজব তাদেরকে মানসিক দিক থেকে অনেক শক্তিশালী করে তুলেছে।

ফাজিলকার মহিলাদের মতে সারাদিন ঘরের মধ্যে থাকতে থাকতে তারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। এই প্রক্রিয়া তাদের মধ্যে নতুন শক্তি প্রদান করবে। শ্যামারাণী এই ফাজিলকা শহরের স্থায়ী বাসিন্দা। তার মতে "সাঁঝা চুলা" সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

আধ-বয়সী বিমলা দেবীর মতে বর্তমান ভারতে দ্রব্যমূল্য আকাশছোঁয়া। দিনে দিনে জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এল. পি. জি. গ্যাস সিলিন্ডার দাম যেখানে প্রতি তিনমাস অন্তর বেড়ে যায়, সেখানে "সাঁঝা চুলা" ভগবানের আশীর্বাদের মতন আভির্ভূত হয়েছে। বিমলা দেবীর মতে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তিনি পনেরো দিনের রান্নার গ্যাস বাঁচাতে সক্ষম হয়েছেন। তার মতে একজন গৃহিনী হিসাবে তিনি তার পরিবারের জন্য যে মাসিক সাশ্রয় করতে সক্ষম হয়েছেন তাতে তিনি খুশী।

ফাজিলকা শহরের আর এক গৃহিনী কবিতা জানালেন যে বর্তমানে আরও সাতটি "সাঁঝা চুলা" ফাজিলকার বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে, গলি এবং গুরুদ্বারে স্থাপিত হয়েছে এবং বিশাল সংখ্যক মানুষ এতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন।

ফাজিলকার গ্র্যাজুয়েট ওয়েলফেয়ার সংগঠন (স্তুষ্ঠ) এতে খুশি। সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐক্যের এই মেলবন্ধন ঘটাতে পেরে তারা উচ্ছ্বসিত। তাদের মতে পারস্পরিক ঐক্য, বন্ধুত্ব এবং সামাজিক মেলবন্ধন ঘটার ফলে সাঁঝা চুলায় যে রুটি তৈরী হবে তা অত্যন্ত সুস্বাদু হবে।

কাঁটাতারের বেড়ার ওপারের মানুষের জীবন দুর্বিষহ

তরুণ কুমার পণ্ডিত ॥ মালদা জেলার কালিয়াচক ৩ ব্লক, বামনগোলা ব্লকের ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়ার ওপারের গ্রামের অধিবাসীরা খাতায় কলমে ভারতীয় হলেও তারা নিজ ভূমিতে পরবাসীর মতো প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যে জীবন যাপন করছেন। একদিকে বাংলাদেশী দুষ্কৃতীদের হয়রানি ও অত্যাচার, অন্যদিকে বি. এস. এফের কড়াকড়ি। কাঁটাতারের বেড়া'র

ওপারে রয়েছে কালিয়াচক ৩নং ব্লকের আকন্দঝরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মিলিক সুলতানপুর, গোলাপগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্মশানী চর, অনন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতি নগর, মহবতপুর, বাখরাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের দৌলতপুর ও পারদেওনাপুর, শোভাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চর বৈদ্যপুর।

বামনগোলা ব্লকের খুটাদহ রাঙামাটি গ্রামগুলির বাসিন্দারা বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানীয় জল ও যোগাযোগের জন্য সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এপারের ওপর। জীবন যাপনের ন্যূনতম চাহিদা থেকে বঞ্চিত প্রায় তিন হাজার মানুষ ভোটার কার্ড দেখিয়ে বি.এস.এফের কাছে দয়ার পাত্র হিসাবে বেঁচে আছেন। বি এস এফ কখন কাঁটা তারের গেট খুলে দেবে তার ওপর নির্ভর করে স্কুলে যাতায়াত করতে হয়। তারা পুনর্বাসনের জন্য সরকারের কাছে দীর্ঘদিন ধরে আবেদন করলেও এখনও পর্যন্ত কোনও সুরাহা হয়নি। বি এস এফের মালদহ রেঞ্জের ডি আই জি প্রভাত সিং টোমার এর বক্তব্য, গ্রামবাসীদের অসুবিধার কথা ভেবে গেট খুলে দেওয়া হয়। বি.এস.এফ-এর জওয়ানরা কাঁটাতারের ওপারের গ্রামগুলির ওপর নজর রাখে। কিছু বাস্তব ঘটনা হলো রাত হলেই এইসব গ্রামগুলি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ-এ পরিণত হয়। রাঙামাটি খুটাদহ প্রভৃতি গ্রামগুলির বাসিন্দারা নিজের তাগিদে কোনও প্রকারে কাঁটা তারের এপারে ভারতে চলে এসেছেন। সরকার কোনও প্রকার ক্ষতিপূরণ বা অনুদান দেয়নি। নিজেদের জমিতে ফসল লাগিয়ে তারা ঘরে তুলতে বেশীর ভাগ সময় পারেন না। এদের দুর্দশার কথা রাজ্যসরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার কেউ ভাবে না।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ মুরলী মনোহর যোশী বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয় কর্তৃক 'গীতা পরিক্রমা' বইয়ের উন্মোচন করছেন। মঞ্চে মোহনলাল পারেখ, যুগল কিশোর জৈথেলিয়া, স্বামী প্রদীপ্তানন্দ এবং ডঃ প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী। 'গীতা পরিক্রমা' পণ্ডিত বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীর বক্তৃতার সংকলন।

আবার নাগা-শান্তিবার্তা শুরু হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সব থেকে পুরনো এবং শক্তিশালী সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী এন এস সি এন (আই-এম)-এর সঙ্গে নতুন মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে শান্তিবার্তা আগামী এপ্রিল মাসে শুরু হতে চলেছে। কেন্দ্র সরকার এবং এন এস সি এন নেতাদের মধ্যে বার্তালাপের প্রক্রিয়া বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল। শেষ পর্যায়ের শান্তি আলোচনা হয়েছিল ২০০৯ এর মার্চে—সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখে। তারপর প্রায় একবছর এই প্রক্রিয়া থমকে ছিল।

এখানে উল্লেখ্য, নাগা জঙ্গি নেতা থুংলাং মুইভা এবং আইজাক চিস্যু বরাবর হল্যাণ্ডের রাজধানী আমস্টারডামেই থাকেন। মাঝে মাঝে ভারতে বা অন্য তৃতীয় রাষ্ট্রে তথাকথিত শান্তি আলোচনায় যোগ দিতে আসেন। তখন তাদেরকে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ বিশিষ্ট অতিথির মর্যাদা দেওয়া হয়। সেই অবসরে নেতারা নাগাল্যাণ্ডেও যান এবং রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদায় জঙ্গিদের কাছ থেকে সামরিক অভিবাদন গ্রহণ করেন। এরকমটাই বিগত দশ-বারো বছর ধরে ঘটে আসছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব জি কে পিল্লাই আসন্ন আলোচনার কথা জানিয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, ভারত সরকারের আমন্ত্রণে এন এস সি এন (আই এম) নেতৃদ্বয় এক থেকে দশ এপ্রিলের মধ্যে আসার সম্ভাবনা জানিয়েছেন। তাড়াতাড়ি সমস্যা সমাধান কল্পে নতুন মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করা হচ্ছে। গৃহমন্ত্রকের এক বিবৃতিতে একথা বলা হয়েছে। মুইভা এসময়ে বিদেশে—সম্ভবত থাইল্যাণ্ডে আছেন। এন এস সি এন—(আই এম)-এর পক্ষ থেকে তার অবস্থান গোপন রাখা হয়েছে।

১৯৯৭ সালে অস্ত্রবিরতি চুক্তি হওয়ার পর এপর্যন্ত পঞ্চাশ দফা শান্তিবার্তা হয়েছে। এটা দক্ষিণ এশিয়ার সর্বাধিক দীর্ঘতম সন্ত্রাসবাদী গতিবিধি। ১৯৪৭ সাল থেকে নাগা সন্ত্রাসবাদীদের হাতে পঁচিশ হাজার মানুষের জীবনহানি ঘটেছে।

স্বরাষ্ট্রসচিব পিল্লাই বলেছেন, "আমরা

আইজাক ও মুইভা।

দীর্ঘ-বিস্তৃত রফায় আশাবাদী। নাগা গোষ্ঠীগুলির এগিয়ে আসাতে আশ্বস্ত। এতে রাজ্যে গোষ্ঠীগত খুনোখুনি বন্ধ হতে সাহায্য হবে। আলোচনা এগোচ্ছে, জঙ্গিদের কট্টর অবস্থান কমছে।"

প্রসঙ্গত, বিগত এক দশক প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রসচিবকে পদ্মনাভাইয়ার দৌত্যে শান্তিবার্তা চলছে। ১৯৯৯-এ পদ্মানাভাইয়াকে কেন্দ্র সরকার মধ্যস্থ করেছিল। গতবছর সরকার তার মেয়াদ বাড়ায়নি। উল্টে সরকার নিজেরাই সরাসরি জঙ্গিবাদের নিরসনে জঙ্গি-নেতাদের সঙ্গে আলোচনার সিদ্ধান্ত নেয়। নাগাল্যাণ্ডে নাগা জঙ্গিদের অপর গোষ্ঠী এন এস সি এন (খাপলাং)-এর সঙ্গে এন এস সি এন (আই-এম) জঙ্গিদের মাঝেমধ্যেই খুনোখুনির পর্যায়ে সঙ্ঘর্ষ হয়। তাদের পরস্পর সঙ্ঘর্ষের জাঁতাকলে সাধারণ শান্তিপ্রিয়, মানুষজন বিপদে পড়েন। সেজন্য চার্চ, জনজাতিদের বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং অন্যান্য সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি ফোরাম গঠিত হয়েছে। ফোরাম এন এস সি এন-এর বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে শান্তি স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছে।

এন এস সি এন (খাপলাং)-এর সঙ্গেও ২০০১ থেকে সরকারের যুদ্ধ বিরতি চলছে। তবে তাদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে শান্তি আলোচনা এখনও শুরুই হয়নি। ১৯৮৮-তে এন এস সি এন ভেঙে এন এস সি এন (আই-এম) তৈরি হয়। গত পাঁচ বছরে এন এস সি এন (আই এম) এবং এন এস সি এন (খাপলাং) জঙ্গিদের মধ্যে পরস্পর গোষ্ঠী সঙ্ঘর্ষে প্রায় পাঁচ শতাধিক জঙ্গি মারা গেছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শতাধিক জঙ্গিগোষ্ঠীর মধ্যে এন এস সি এন (আই এম) সবচেয়ে পুরাতন এবং শক্তিশালী। এতদিন তারা স্বাধীন নাগা রাজত্ব স্থাপনে লড়াই চালিয়ে আসছে। তবে ইদানীং বৃহত্তর নাগাল্যাণ্ডের দাবীতে সোচ্চার। তারা আশপাশের নাগাল্যাণ্ড সন্নিহিত অসম, মণিপুর, অরুণাচলপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যের নাগা বসতিযুক্ত এলাকাকে যুক্ত করে বৃহত্তর নাগাল্যাণ্ড বা তাদের ভাষায় 'গ্রেটার নাগালিম্' গড়তে চায়। এই দাবী ওইসব রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রও ইতিপূর্বে নাকচ করে দিয়েছে।

মধ্যপ্রদেশে বিজেপির জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক

পথ চলার অঙ্গীকারেই স্বাতন্ত্র্য রক্ষার শপথ

ইন্দোরে বিজেপি সভাপতি নীতিন গড়কড়ি, লালকৃষ্ণ আদবানী, সুষমা স্বরাজ, শিবরাজ সিং চৌহান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ একটি সর্বজনশ্রুত খবরের কথা উল্লেখ করতেই হচ্ছে। খবরটা এইরকম— গত ১৮ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে ভারতীয় জনতা পার্টির জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক সমাপ্ত হয়েছে। বৈঠকে বিজেপি সভাপতি নীতিন গড়কড়ি সহ অন্যান্য সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ যেমন লালকৃষ্ণ আদবানী, লোকসভার বিরোধী দলনেত্রী সুষমা স্বরাজ, অরুণ জেটলি, রাজনাথ সিং, বেঙ্কাইয়া নাইডু উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীসহ বিজেপি শাসিত রাজ্যের অন্যান্য মুখ্যমন্ত্রীরাও ছিলেন। ছিলেন গড়কড়ির পরামর্শদাতা বিনয় সহস্রবুদ্ধেও। সারা দেশ থেকে বিজেপির প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। মুরলীমনোহর যোশী সহ বিজেপির প্রায় সমস্ত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

খবরটা এপর্যন্ত মোটামুটি ঠিকই আছে। কিন্তু বেজায় মুশকিলে পড়া গেছে এই খবরের 'হেডলাইন'টা কি হবে তাই নিয়ে। প্রথমে ভাবা গেছিল যে শিরোনাম হওয়া উচিত 'মধ্যপ্রদেশে মহারণ'। কিন্তু তাতেও গেরো। মহারণের জন্য ন্যূনতম একটা রণক্ষেত্র থাকা উচিত। কিন্তু 'রামমন্দির' প্রসঙ্গে যখন গড়কড়ি নতুন করে বিজেপির 'শপথ' ঘোষণা করেছেন, বলে দিচ্ছেন রামমন্দির গড়ে তুলতে হবে অযোধ্যাতেই। আর দেশের মানুষের যাবতীয় 'সেন্টিমেন্ট'-কে গুরুত্ব দিয়ে মুসলমানরাও রামমন্দির গড়ে তুলতে সহায়তা করুক। কংগ্রেসী পেটেন্ট 'সাম্প্রদায়িক রাজনীতি'র উর্দ্ধে উঠে যখন একেবারে নতুন বিজেপি সভাপতি মুসলিমদের আশ্বাস দিচ্ছেন, রামমন্দির গড়তে তারা সাহায্য করলে তার পাশেই যাতে মসজিদ গড়ে তোলা যায় সেব্যাপারেও সচেষ্ট হবেন গড়কড়িরা। তো এইরকম মন্তব্যের পরে রণক্ষেত্র তৈরি হবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও দেখা গেল না। অগত্যা বাতিল করতেই হলো প্রথমোক্ত ভাবনা হওয়া শিরোনামটিকে।

এই বিষয়ে পরবর্তী ভাবনা 'মধ্যপ্রদেশে মহাযজ্ঞ'। কিন্তু এমনি ভাবনাতেও বিস্তর বাধা এল। গড়কড়ির রাজনৈতিক পরামর্শদাতা বিনয় সহস্রবুদ্ধে। এই ভদ্রলোকটি আপাদমস্তক 'সংগঠনে' বিশ্বাসী। সুতরাং ইন্দোর থেকে 'কংগ্রেসী সংস্কৃতি'র পঞ্চ ত্বপ্রাপ্তি হলো। নেতা সুলভ হাব-ভাব ছেড়ে বিজেপি নেতৃত্বের তাঁবুতে রাত কাটানো আর বৈঠকে নিয়মিত হাজিরা। এই পরিস্থিতিটাকে মহাযজ্ঞ-টজ্ঞ বললে সেটা ভারি বেমানান ঠেকবে।

দু'দুবার এহেন ভাবনার গঙ্গাপ্রাপ্তির পরে যাবতীয় সাহিত্যিকতা বাদ দিয়ে শিরোনাম সংক্রান্ত ভাবনাটি এল এইভাবে— 'মধ্যপ্রদেশে অনুষ্ঠিত বিজেপি-র জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক।' কিন্তু এই সহজ চিন্তাটা গুলিয়ে গেল গড়কড়ি অ্যান্ড কোং-এর কীর্তিকলাপ দেখার পর। নিতান্ত 'বৈঠক' বললে জিনিসটাকে খুব ভুল ভাবে ব্যাখ্যা করা হবে। 'কমিউনিস্ট' সুলভ 'পলিটব্যুরো' মার্কা বাক্যবাগীশের বৈঠক নয় এটি। সাংগঠনিক কর্মকুশলতা থেকেই আপাতত স্থির হয়েছে 'কনফ্রন্টেশানিস্ট (মুখোমুখি সংঘর্ষ) পলিটিক্স' থেকে মুখ ফিরিয়ে সমস্ত শক্তিকে সংহত করে অন্য ধরনের কিছু করার প্রয়াস একটা থাকবেই (বিজেপি নেতারা এটাকেই বলছেন 'ইনক্লুসিভ')।

এই জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক থেকে আরও একটা ভাবনা মাথায় আসতে পারে। বিজেপি নেতৃত্ব বলছেন যে টেকনোলজি সমৃদ্ধ 'গ্রামোদয়' যোজনা তৈরি হবে। যার প্রধান উদ্দেশ্য 'কার্যকর্তা' তৈরি করা। নেতৃত্বের গ্রহণযোগ্যতার পাশাপাশি কর্মীদেরও নেতৃত্বে তুলে আনা, তাদের যে কোনও ভাল কাজে পুরস্কৃতও করা হবে। তবে শিরোনামটা দেওয়া যাক না কেন— 'কার্যকর্তা তৈরির সম্মেলন বিজেপি-র।'

যাঃ, বড্ড খেলো হয়ে যাবে। যে সম্মেলন 'কর্মী'দের হয় না, 'কার্যকর্তা'দের হয়, তাকে 'সম্মেলন' বললে বেশ বেমানান ঠেকবে। আর এই উক্তির সত্যতার একশ শতাংশ প্রমাণিত হচ্ছে, বিজেপির রাষ্ট্রীয় কর্মসমিতির বৈঠকে। সন্ত্রাস প্রশ্নে কেন্দ্রের নরমনীতির তুলোধুনা করেছেন বিজেপি-র 'কার্যকর্তারা'। এই তুলোধনা করতে গিয়ে রীতিমতো যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছেন তাঁরা।

বিজেপির কর্মসমিতির এই বৈঠকটিকে উন্নয়নকারীদের বৈঠক বললে খুব একটা খারাপ বলা হবে না। বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা ছিলেনই। তারা নিজেদের রাজ্যের উন্নয়ন সংক্রান্ত লম্বা ফিরিস্তি পেশ করার পর সকলকে আহ্বান করলেন একবার তাদের রাজ্যে ঘুরে যাবার জন্য। বৈঠক থেকে আরও একটা জিনিস পরিষ্কার হলো, সর্বভারতীয় চিত্রটা যেমনই হোক না কেন, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে কর্মসংস্থানের হাহাকার তুলনামূলকভাবে অনেক কম। যার প্রাথমিক দাওয়াই—কার্যকর্তাদের ধারণ ক্ষমতা (বিজেপি নেতৃত্ব যেটাকে বলছেন 'ক্যাপাসিটি') বাড়াতে হবে, পার্টির কাজ সর্বব্যাপী করার সাথে সাথে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদেরও মানুষের মাঝে পৌঁছতে হবে। যেসব রাজ্যে বিজেপি বিরোধী দলের ভূমিকায়, সেই রাজ্যেও বেকার সমস্যা নিয়ে তাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এই ধরনের চিন্তাভাবনা 'স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল' (পার্টি উইথ আ ডিফারেন্স)-এর ভাবনাকেই উস্কে দিল কিনা কে জানে!

গড়কড়ি-সহস্রবুদ্ধে জুটি আপাতত ঠিক করেছেন, ত্রি-স্তরীয় 'প্রশিক্ষণ মহাযোজনা'-র ব্যবস্থা করা হবে। উন্নয়ন আর সেবাকেই কেন্দ্রবিন্দু করে আগামী কয়েক বছর এগিয়ে চলবে বিজেপি। চলার পথে মূল্যবৃদ্ধি থেকে শুরু করে নাগরিক সুখ-দুঃখের স্মৃতিই হবে বিজেপি-র পথ চলার সঙ্গী। কি বলা যাবে তবে ইন্দোরে আয়োজিত বিজেপি-র জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠককে? পথ চলার অঙ্গীকার? যে অঙ্গীকারকে মূল রাজনৈতিক 'অ্যাজেন্ডা' করল 'স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী' হতে চাওয়া একটি রাজনৈতিক দল।

পদ্ম পুরস্কার— তোষামোদের রাজনীতি

ডি আইয়ার ॥ ২০১০-এর পদ্ম পুরস্কার ঘোষণা হওয়ার পর থেকে সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট হচ্ছে যে পুরস্কারের নামে কিভাবে তোষণনীতি চলছে বিগত ৬০ বছর ধরে। আর সেখান থেকে একটা জিনিস পরিস্কার হচ্ছে সুস্থ ও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে শক্তিশালী বিরোধী দল থাকা কত প্রয়োজন। নইলে সরকারের এই কুকর্ম তুলে ধরবে কে? শুধু পদ্ম পুরস্কারই নয়, একই অভিযোগ উঠেছে অন্যান্য 'জাতীয় পুরস্কার' দেওয়া নিয়েও।

এবারে ৬ জন পদ্মবিভূষণ, ৪৩ জন পদ্মভূষণ ও ৪১ জন পদ্মশ্রী পেয়েছেন। আর এই তালিকারই বেশ কয়েকজনের নামে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ। এমনকী ফৌজদারি মামলাও দায়ের করা আছে। ভারতের প্রথম পেশাদার স্নুকার প্লেয়ার ইয়াসিন মার্চেন্ট নিজে পদ্মশ্রী না পেয়ে ক্ষোভে রাহুল গান্ধীকে চিঠি লেখেন। সেখানে উনি বিস্তারিতভাবে সেইসব নামের তালিকা পাঠান যারা বিভিন্ন দুর্নীতি ও মামলায় জড়িত থাকা সত্ত্বেও পদ্ম পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। তার অভিযোগ, এমন অনেককে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে যারা লুপ্তপ্রায় পশুপাখি শিকারের দায়ে অভিযুক্ত, যারা 'লিভ-ইন' সম্পর্কে জড়িত, যারা নিজেদের বউ-ছেলে-মেয়ে ছেড়ে অন্যদের সাথে ঘর করছে। ইয়াসিন মার্চেন্ট এ ব্যাপারে যে প্রশ্ন তুলেছেন তা যথেষ্টই সংগত। তার জিজ্ঞাসা, এইরকম লোকেদের ভারতের অসামরিক স্তরের এই সমস্ত হাই র‍্যাঙ্কের পুরস্কার দিয়ে আমরা যুব সমাজকে কি বার্তা দিচ্ছি। এখনও যুব সমাজ পুরস্কারের চটকে বিশ্বাসী। তাই তারা এরকম 'ইয়ুথ আইকন'-কে রোল মডেল ধরে এগোতে চায়। সেখানে এ জাতীয় লোকেদের যদি আমরা আইকন বানিয়ে দেখাই তাহলে ভবিষ্যৎ যুব প্রজন্ম কি এরকম অনৈতিক লিভ-টুগেদার বা অন্যান্য অসুস্থ জীবন-যাপনে উৎসাহিত হবে না?

বিপান চন্দ্র, মল্লিকা সারাভাইদের সামাজিক অবদান বলতে দীর্ঘদিন ধরে বিকৃত ইতিহাস রচনা এবং তাতে ভারতের সবকিছু নীচ, হীন বলে দেখানো আর গুজরাটে নরেন্দ্রমোদীর বিরোধিতা করে সেখানে পাকিস্তানপন্থী কাজে মদত দেওয়া। আর তার জোরেই একেবারে পদ্মভূষণ। এরকমভাবে বিশ্লেষণ করলে পুরোটাই যে কত জালিয়াতি আর দেশ বিরোধিতার পুরস্কার হিসাবে পদ্ম দেওয়া হচ্ছে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। কিন্তু এ সবকে ছাপিয়ে উঠেছে দুটো নাম।

(১) সন্ত সিংহ চাটোয়াল ও
(২) গুলাম মহম্মদ মীর।

সন্ত সিংহ চাটোয়াল

প্রথমজন পদ্মভূষণ ও দ্বিতীয়জন পদ্মশ্রীতে ভূষিত। সংক্ষেপে প্রথমজন একজন অনাবাসী ভারতীয় হোটেল ব্যবসায়ী। যার অবদান বলতে কর ফাঁকি। ব্যাঙ্ক ঘোটালা সম্পর্কিত বেশ কিছু জালিয়াতিতে অভিযুক্ত মামলা চলছে। আর দ্বিতীয়জনের অবদান হলো সে একজন প্রাক্তন জঙ্গি। এখন অস্ত্র বিসর্জন দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। বিজেপি-র তরফ থেকে বিরোধিতা না আসলে তো জানাই যেত না যে পদ্ম পুরস্কারের নামে টাকার খেলা ও বিদেশী প্রভাব কাজ করছে। স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার ৯০ লক্ষ মার্কিন ডলার ঋণ নিয়ে আত্মসাৎ করার পরও শুধুমাত্র ক্লিন্টন লবির জোরে তিনি পদ্মভূষণে বিভূষিত। রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিলের আপত্তি সত্ত্বেও তার নাম সুপারিশ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রফুল্ল প্যাটেল ও ভায়লার রবি। তবে কোনও কোনও মহল থেকে শোনা যাচ্ছে—সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হওয়া ইন্দো-মার্কিন নিউক্লিয়ার চুক্তি যাতে স্পষ্টভাবে হয় তার জন্য চাটওয়াল নিজে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই পদ্মভূষণ তারই পুরস্কার স্বরূপ। অথচ ২০০০ সালে ক্লিন্টনের ভারত সফরের সময় ক্লিনটনের শত অনুরোধেও বাজপেয়ী সরকার বিশেষ সরকারি ভোজে চাটওয়ালকে রাখেনি। শুধুমাত্র তার জালিয়াতি কাজের অভিযোগের জন্য। কিন্তু আজ চাকা ঘুরেছে। আজ সে বিদেশে কংগ্রেসি সমর্থক তৈরি করার পুরস্কার পাচ্ছে। পুরস্কার আছে দেশের টাকা মেরে নেওয়ার। যেভাবে সুইস ব্যাঙ্কে কোটি কোটি ডলার জমিয়ে রেখে দেশকে বেচে আজ সাধু সেজে বসে আছে কংগ্রেসি নেতারা, তাদের চামচেগুলো এর থেকে কী আর ভালো হবে।

ঠিক একইভাবে কাশ্মীরের এক প্রাক্তন জঙ্গি গুলাম মহম্মদ মীর ওরফে মোম্মা কানাকে পদ্মশ্রী দেওয়া হয়েছে। এই খবর শোনার পর স্বয়ং জম্মু-কাশ্মীর সরকারও আশ্চর্য। তারা বলছে তাদের সুপারিশ ছাড়াই কেন্দ্র এই কাজ করেছে। ১৯৯০-এর সময়ে যখন কাশ্মীরে জঙ্গি বাড়বাড়ন্ত প্রবল তখনকার জঙ্গি এই মোম্মা কানা। পরবর্তী সময়ে বয়সের ভারে জঙ্গি জীবন ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরেছে। ত্রুত্রস্তুনস্ত ক্রন্দ্ধজুনস্তন্দ বলতে তার অবদান এটাই। তবে এটাও শোনা গেছে এখনও 'দারুল-ইসলামের' স্বপ্নে বিভোর থাকেন তিনি।

একইরকম ভাবে সম্প্রতি খবরে উঠে এসেছে আরও একটি নাম। অ্যান্ড্রিয়াস মারউইন। ইনি গত বছরেই উপরাষ্ট্রপতির হাত থেকে 'জাতীয় যুব পুরস্কার' পেয়েছেন। যুবকদের সংগঠিত করার প্রশংসনীয় উদ্যোগের জন্য। আর সেই লোকই গত ২২শে জানুয়ারি গ্রেফতার হয়েছে গুয়াহাটি পুলিশের হাতে। তিনি বিগত বেশ কয়েক বছর ধরেই 'ভ্রুক্তস্ট্র' নামক জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার আড়ালে এই জঙ্গি সংগঠনের হয়ে ছেলে যোগাড় করার কাজ করতেন তিনি। আর এই ছিল তার যুবকদের সংগঠিত করার লক্ষ্য। বিগত ৫ বছরের কংগ্রেসি জমানাতেই ওঁর সংস্থা সরকারি আনুকুল্যে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। তার মূল কারণই হলো, কিছু ভালো নেতা-নেত্রী থাকলেও মূলত ছদ্মজাতীয়তাবাদী, দেশদ্রোহী ও ভ্যাটিকান-এর অঙ্গুলি হেলনে যে সরকার চলে তার কাছ থেকে এর থেকে বেশি কী আর আশা করা যায়।

কিন্তু কেন এমন হচ্ছে? কি ভাবেই বা হচ্ছে? এর জন্য একটু পদ্ম পুরস্কারের ইতিহাসটা দেখে নেওয়া যাক।

বৃটিশ শাসনের সময় অনুগত রাজা, জমিদার, কর্মচারীদের আনুগত্যের ভেট হিসাবে বিভিন্ন পুরস্কার দেওয়া হতো। স্বাধীনতার পর সেগুলি বিলুপ্ত করে ১৯৫৪ সালে এই বিশেষ পদ্ম পুরস্কারের প্রথা চালু হয়। সামরিক ক্ষেত্রে যেমন বীরত্ব ও দেশরক্ষার অবদানের জন্য অশোকচক্র, পরমবীরচক্র প্রভৃতি দেওয়া হয়, তেমনি অসামরিক তথা সামাজিক ক্ষেত্রে অবদানের জন্য, বিশেষ কৃতিত্বর স্মারক হিসাবে ভারতরত্ন ও তিনটি পদ্ম পুরস্কার দেওয়া শুরু হয়। আর এখানেই উঠেছে একটা প্রশ্ন। এই পুরস্কার কি বিজ্ঞান, কলা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসাবে দেওয়া হবে, না কি ভারত গঠনে ওই বিশেষ ব্যক্তির কি ও কত অবদান তার উপর ভিত্তি করে দেওয়া হবে। পাশাপাশি, পদ্ম পুরস্কার চয়নের যে কমিটি তারা কাদের নিয়ে তৈরি? এরা সব উচ্চপদস্থ আমলা। প্রথমে রাজ্য তথা কেন্দ্রর বিভিন্ন দফতর থেকে বিভিন্ন লেখকের নাম সুপারিশ করা হয়। এই নামগুলো 'Award Committee'-র কাছে আসে। এই কমিটি গঠিত হয়—প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, ক্যাবিনেট সচিব;স্বরাষ্ট্রসচিব;রাষ্ট্রপতির সচিব ও তিন-চার জন সমাজের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের নিয়ে। এখন এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার চয়নের কমিটিই যখন গোলমেলে আমলা- তান্ত্রিক অচলায়তনে আবদ্ধ তখন সেখান থেকে পুরস্কারের গুণমান বজায় রাখা কি সম্ভব। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে এই চার জন আমলা কিভাবে বিচার করবেন যে মল্লিকা সারাভাই' পদ্মভূষণ না পদ্মশ্রী পাওয়ার যোগ্য। আর এখানেই মূল প্রহসন লুকিয়ে। ২০০৮ সালে প্রণব মুখোপাধ্যায়কে 'পদ্মভূষণ' দেওয়া হয়েছিল। সে সময় খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ নিয়ে অভিযোগ তুলে বলেছিলেন, পদ্ম পুরস্কার এখন রাজনীতিক পুরস্কার হয়ে গেছে। সাঁতারু বুলা চৌধুরীকে পদ্মশ্রী ও প্রণববাবুকে পদ্মবিভূষণ দেওয়ার প্রতিবাদে এই অভিযোগ এনেছিলেন দিদিমণি। কিন্তু আজ চুপ। সত্যি ভোটের জোট বড় বালাই। ২৭ ও ২৮ জানুয়ারি, ২০০৮-এর সমস্ত কাগজেই মমতার এই ক্ষোভ ছাপা হয়েছিল। বাজপেয়ী জমানাতেও ২০০৩ সালে পদ্ম পুরস্কার দেওয়ার সময় বিরোধীরা এই অভিযোগ এনেছিল। তখন এনডিএ সরকার তড়িঘড়ি রাষ্ট্রপতির কাছে মতামত চাইলেন। সে সময়কার রাষ্ট্রপতি আব্দুল কালামজী তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীজীকে চিঠি লিখে এই পুরস্কার চয়নের ব্যাপারে কড়া হতে নির্দেশ দেন। তিনি কড়াভাবে চয়নের ক্ষেত্রে 'নারায়ণন কমিটি'র সুপারিশ মানতে বলেন। বাজপেয়ী নিজে উদ্যোগ নিয়ে সে সময় সমস্ত পুরস্কার প্রাপকদের সম্বন্ধে খোঁজ নেন ও বিষয়টিকে স্বচ্ছভাবে মেটান। কিন্তু ১৯৫৪ থেকে আজ অবধি যতবার এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে কোনও বারই এরকম শুদ্ধিকরণের ব্যবস্থা করা হয়নি। মানা হয়নি 'নারায়ণন' প্যানেলের গাইডলাইন। আর সেই কারণেই 'সইফ আলি খান' পদ্মশ্রী পায়। আসলে যতদিন না এই সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানাবার জন্য বিরোধীরা এককাট্টা হয়ে লড়াই করছে ততদিন এমন চলতে থাকবে। তোষামোদ ও তোষণবাদের চরম নিদর্শন হয়ে দাঁড়াবে এই জাতীয় পুরস্কার। ইতিমধ্যেই 'নেলসন ম্যান্ডেলা'কে ভারতরত্ন দেওয়ার থেকেই পুরস্কারের আর সেই গ্ল্যামার নেই। যে কারণে নেতাজীকে মরণোত্তর ভারতরত্ন দিতে চাওয়ায় বিভিন্ন মহলে থেকে প্রতিবাদ ওঠে। ঠিক তেমনি সমস্ত জাতীয় পুরস্কারই হয়ে দাঁড়াবে জাতীয় রসিকতায়। সাধু-সাবধান।

‘মুসলমানদের অনগ্রসরতার কারণ কু-সংস্কার, তালাক-প্রথা ও পরিবার-পরিকল্পনার অভাব’

স্বস্তিকার পাতা ওল্টানো আর তারই ফাঁকে সটান জবাব। — ছবি ঃ শিবু ঘোষ

একান্ত সাক্ষাৎকার

মহাশ্বেতা দেবী

স্বস্তিকা পড়েননি সেভাবে। তবু এর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে তাঁর মনে হয়েছে বামবিরোধী কণ্ঠস্বরে সরকারের সমালোচনা করার এহেন প্রয়াস একমাত্র কলকাতা বলেই সম্ভব। বুদ্ধিজীবী মহলে ‘ওরা’ দলভুক্ত(প্রবীণা লেখিকা মহাশ্বেতাদেবী মন খুলে কথা বললেন ‘স্বস্তিকা’র সঙ্গে। শুনলেন আমাদের প্রতিনিধি অর্ণব নাগ।

শু প্রথমেই যেটা জানতে চাইব গত ১৪ জানুয়ারি আপনি ৮৫ বছরে পদার্পণ করলেন, সাহিত্য-জগতেও আপনার প্রায় সাড়ে পাঁচটি দশক অতিক্রম করা হয়ে গিয়েছে। এতদিন পরে বুদ্ধি জীবী জগতে আপনি ‘ওরা’ দলভুক্ত। এই তকমার অনুভূতিটা কেমন?

প্ত আমার কোনও অনুভূতি নেই। কারণ এনিয়ে আমি কিছুই ভাবি না। আমার ভাবার সময়ও নেই। আমি যা পেরেছি, তাই করেছি। এখন যদি বলা হয় যে পরিবর্তন চেয়েছি বলে আমরা অন্যরকম কিছু;আমার ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়, এই কারণে যে গত বিয়াল্লিশ বছর ধরে সৃজনশীল লেখার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদধর্মী লেখাও চিরকাল লিখেছি। কোনও দিন দৈনিক বসুমতীতে, সে কাগজ এখন আর নেই। যুগান্তরে লিখেছি অনেকদিন, সেটাও উঠে গেছে। এখনও বিভিন্ন সংবাদপত্রে লিখে চলেছি। যখন লিখেছি তখন সবসময়েই কিন্তু সিপিএমের রাজ্য সরকার ক্ষমতায় ছিল এবং তাদের বিরুদ্ধেই লিখেছি। এর আগে কংগ্রেস আমলেও প্রতিবাদ করেছি।

শু অর্থাৎ আপনি প্রথম থেকেই ‘ওদের’ দলে। কিন্তু বিগত ৩৪ বছরে সিপিএমের এতটা ক্রোধ আপনি ছাড়া আর কেউ কখনও উৎপাদন করতে পেরেছে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে! যে কারণে আপনার গায়ে ‘মাওবাদী’ তকমা লাগিয়ে পুলিশি নিগ্রহের একটা চেষ্টা করা হলো। কিভাবে দেখছেন পুরো ব্যাপারটাকে?

প্ত যেহেতু কিছু করেই কোনও লাভ হয়নি, তাই আমি ওসব নিয়ে ভাবিই না। ওরা কি চেষ্টা করেছে না করেছে;তাতে আমার কিছু এসে যায় না।

শু এর সম্ভাব্য একটা কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে যে, আপনারা মনে করছেন, “ল্দ্দবন্দ্রব্ধ (বামপন্থা) নব্দ ত্মনন্ধড়ব্ধ (সঠিক)ত্রুস্তু ত্মনন্ধড়ব্ধ (দক্ষিণপন্থী, এক্ষেত্রে তৃণমূল) নব্দ ল্দ্দবন্দ্রব্ধ (বামপন্থী)”। আপনি কি ভাবছেন?

প্ত আমি এসবের মধ্যে নেই। আমি সারাজীবন মানুষের জন্য কাজ করেছি, আর এই সমাজব্যবস্থায় দাঁড়িয়েই সেই কাজটা করেছি। কলকাতা পুলিশ কেন, দিল্লী পুলিশেরও কোনও ক্ষমতা নেই যে আমার ক্ষতি করবে।

শু মাওবাদী-বিরোধী অভিযানে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ পরিকল্পনা ‘অপারেশন গ্রীনহান্ট’। এখানে নামটা একটা বড় ফ্যাক্টর। বলা হচ্ছে, ‘রেড করিডর’ থেকে মাওবাদী সরিয়ে সেখানে ‘গ্রীন’ মানে সবুজ উদ্ধার করার একটা প্রচেষ্টা থাকবে। এই ‘অপারেশন গ্রীনহান্ট’ নামটার ক্ষেত্রে আপত্তিকর কোনও বিষয় দেখতে পাচ্ছেন?

প্ত কেন্দ্রীয় সরকার এই কাজটা করছেন নিজেদের ‘বাঁচা’র তাগিদে। মানুষের কাছে তাঁরা প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। কারণ তাঁদের অকর্মণ্যতা ও শোচনীয় ব্যর্থতা। একটা জিনিস দেখলেই এটা বোঝা যায়। লালগড়ে এমন কিছুই ঘটেনি যার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো উচিত ছিল। সেজ (স্পেশাল ইক্‌নমিক জোন)-এর ক্ষেত্রে একটা কথা এসেছে—‘আদিবাসী’। কে আদিবাসী নয়? এই যে তুমি যেখানে বসে আছ, এখানেও আদিবাসী আছে। ‘সেজ’-এর বিরুদ্ধে সারা ভারতজুড়ে আন্দোলন সংঘটিত হচ্ছে। অনেক চাষী আত্মহত্যা করেছেন। আসলে যারা গরীব, যাদের রেশনকার্ড নেই তারাই এক্ষেত্রে ‘ব্যবহৃত’ হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে ‘সেজ’-এর নামে যেটা হচ্ছে, তাকে জিন্দালদের আরও ধনী করার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। (শালবনীর) খনিজ-সম্পদ সমৃদ্ধ এলাকাকে ৩৪ বছর ধরে কাজে লাগাবার কোনও চেষ্টাই করল না রাজ্য-সরকার। ওখানে বন আছে, চাষ-বাস খুব একটা হয় না। ওখানকার মানুষরা ভীষণ দুর্দশাগ্রস্ত। যখন চাষ-বাস হয় না তখন ওখানকার ভাষায় লোকেরা বলেন ‘পুবে খাটতে গেছি’, ‘নামাল খাটতে গেছি’। এই যে এমন খনিজ সম্পদসমৃদ্ধ এলাকার মানুষেরা কাজের অভাবে বাইরে চলে যাচ্ছেন—এটা সরকারের চূড়ান্ত ব্যর্থতা। এখন এই জায়গাটা জিন্দালদের হাতে তুলে দেবে বলে সরকার মাওবাদী-মাওবাদী বলে চেঁচাচ্ছে। আমরা তো মনে করি, এই যে ‘সো-কলড’ মাওবাদী যাদের বলা হচ্ছে...এটা নিয়ে আমি কিছুদিন আগে লিখেওছি।

শু আপনি তবে সরকারের বিরুদ্ধে যে মাওবাদীরা লড়াই করছে তাদের ‘সো-কলড’ মাওবাদী বলবেন, ‘জেনুইন’ মাওবাদী বলবেন না?

প্ত আমি ‘জেনুইন’ মাওবাদীদের কোনওদিন দেখিনি, এদেরও নয়। তবে আমার মনে হচ্ছে এদেরকে ‘মাওবাদী’ আখ্যা দিয়ে আসলে শাসক দলেরই কোনও উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে। এই কথাটা কেন বলছি? কারণ ওখানকার লোকেরা মরছে। আর ‘উন্নয়ন’ কথাটা এখন এত জঘন্যভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে যে কথাটাকে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলা উচিত। ‘উন্নয়ন’ মানেটা কি? সিপিএম ৩২ বছর ধরে ওইসব জায়গায় জল-আলো দিতে পারেনি। শুধু ওখানে কেন? সমগ্র গ্রামবাংলাতেই তো আলো নেই। লালগড়ের লোকেরা তো বলছে, ওদের ওখানে টিউবওয়েল বসানো যায় না, গ্রামে গ্রামে থাকার মধ্যে আছে খালি পাতকুয়ো। এই যে সেনাবাহিনী, হেন-তেন ওসব জায়গায় ঘুরছে, তারা প্রতিটা পাতকুয়োয় মলত্যাগ করতে করতে গিয়েছে।

শু আপনি কি এটাই বলতে চাইছেন যে দারিদ্র্যের প্রতি এই বঞ্চনাই তথাকথিত মাওবাদের উৎস?

প্ত খেতে না পেলে মানুষ বিদ্রোহ করবেই। বঙ্কিমের উপন্যাস পড়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরিপ্রেক্ষিতে বিশাল সন্ন্যাসী বিদ্রোহ হয়েছিল।

শু এবার তো বইমেলায় গিয়েছিলেন?

প্ত একদিনই তো গেলাম। (অস্ফুটে) ওই এক হতভাগা বই উদ্বোধন করতে!

শু বইটা (তৃণমূল সাংসদ সুমন চট্টোপাধ্যায়ের ছত্রধরের গান) খুব জ্বালিয়েছে না?

প্ত প্রশ্নটা কি? তবু কেন গেলাম, তাই তো?

শু (হাসি)

প্ত আমি ওটা করে যদি বিতর্ককে আহ্বান করে থাকি...! আমি কিন্তু সেটা করতেই পারি। কারণ আমি জানি আমি কি করছি। যখন যেটা দরকার, তখন সেই কাজটা করতেই হয়। দ্যাটস অল।

শু এবারের বইমেলায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সরকারি অপদার্থতার যাবতীয় দায়ভার চাপিয়ে দিয়েছেন পরিবেশবিদদের ঘাড়ে। কিভাবে দেখছেন বিষয়টাকে?

প্ত শোনো, এরকম বলার কারণ হচ্ছে সুভাষ দত্ত। তিনি পরিবেশের ব্যাপারটা খুব ভাল বোঝেন। তিনি ময়দানে বইমেলার বিরুদ্ধে বলেছিলেন। যেটা খুব সঠিক ছিল। আর মেলাতে তো শুধু বই কেনা-বেচাই হয় না, এত রান্না, খাওয়া, অমুক-তমুক চলে, এসব অসভ্যতাও তো বন্ধ হওয়া দরকার। আসলে সরকার যা যা বিষয়ে সুবিধে পেয়েছিল, তার কোনও কিছুরই সদ্ব্যবহার করতে পারেনি।

শু আপনি ২০০৬ ফ্রাঙ্কফুট বইমেলায় গিয়ে একটা স্মরণীয় উক্তি করেছিলেন। একটা জনপ্রিয় হিন্দীগানের সুরে বলেছিলেন ‘ফির ভি দিল হ্যায় হিন্দুস্থানী’। সেই হিন্দুস্থানী দিলের অভাবই তবে কি এবারের বইমেলায় চোখে পড়ল?

প্ত আমি সেখানে আরও একটা কথা বলেছিলাম-‘রাইট টু ড্রিম ইজ্ মোস্ট ফান্ডামেন্টাল রাইট’। সব মানুষের স্বপ্ন দেখার অধিকার আছে। কিন্তু এবারের মিলনমেলা বইমেলায় আমি কোনও ‘স্বপ্ন’ আশা করিনি। আরেকটা কথাও বলব। রাজ্য সরকারের ‘ইনভলভমেন্ট’ এবারের বইমেলায় খুব কম ছিল। কিন্তু কলকাতার মতো পুস্তক-মনস্ক শহর ভূ-ভারতে খুঁজলেও তুমি দুটো পাবে না।

শু এহেন পুস্তক মনস্ক শহরে তসলিমা নাসরিন অচ্ছুত হন কি করে?

প্ত এই ক্ষেত্রে আমি বলব পশ্চিমবঙ্গ সরকার মৌলবাদী মুসলিমদের ব্যবহার করেছে। মৌলবাদী মুসলিমরা কি করতে পারত জানি না, কিন্তু বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রশাসন তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এখন কথা উঠছে (মুসলমানদের মধ্যে) এই ‘রাইট’ পেলাম না, ওই ‘রাইট’ পেলাম না। এটা একটা ‘ব্যাড থিঙ্কিং’। এক শহরে থাকতে গেলে সবাই-কে মিলেমিশে থাকতে হবে। এক্ষেত্রে (মুসলিমদের) বিশেষ অধিকারের কোনও কথা উঠতে পারে না।

শু হিন্দুদের মধ্যে বহুদিন যাবৎ একটা ‘বর্ণাশ্রম প্রথা’ বিরাজমান ছিল। কিন্তু ইসলামকে যে সিপিএম ‘সাম্যের ধর্ম’ বলে প্রচার করে এসেছে তারাই আজকে মুসলমানদের মধ্যে ‘অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী’ আবিষ্কার করলেন কী করে?

প্ত প্রথমেই বলি হিন্দু-সমাজ যথেষ্ট খোলামেলা। সকলেই তো আর রক্ষণশীল নন। সেই সমাজে চতুর্বর্ণের-এর একটা ব্যাপার ছিল। হয়তো কিছু বীভৎস নিয়ম-নীতিও ছিল। কিন্তু নাইনটিন সেঞ্চুরির গোড়া থেকেই রামমোহন, বিদ্যাসাগর এঁরা আসায় একথা অনস্বীকার্য যে সমাজের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। আর মুসলমানদের মধ্যেও অনেকে মুচি, কেউ বা দরজি, যারা রাস্তায় চামড়ার ব্যাগে জল দিত তাদের ভিস্তিওয়ালা বলা হোত, তারা ছিল। যাই হোক, এরাও তো মুসলমান সমাজের মধ্যে আছে! প্রথম থেকেই আছে। এমনিতে, মুসলমান সমাজের অবস্থা জঘন্য। এতে কোনও সন্দেহ নেই।

শু মুসলমানদের এই অনগ্রসরতার জন্য কোনও ‘বিশেষ কারণ’ হিসেবে কিছু চিহ্নিত করতে চাইবেন?

প্ত প্রথমেই চিহ্নিত করব তাদের কু-সংস্কারকে। দ্বিতীয়ত, তাদের সমাজের মহান অভিশাপ হচ্ছে তিন তালাক দেওয়ার প্রথা, তৃতীয়ত, ওখানে পরিবার-পরিকল্পনার কোনও বালাই নেই, কুৎসিত একেবারে! সেই কারণে তাদের জনসংখ্যার কোনও লেখালিখি নেই। নটা ভাই, সাতটা বোন, এটা তাদের সমাজে অবিরত চোখে পড়বে। ইরাক, ইরান, ইজিপ্ট কোনও দেশেই এই জিনিসটা হয় না। ওসব দেশে জীবনের একটা আলাদা তাগিদ আছে। কিন্তু ভারতের ব্যাপারটা একেবারেই অন্য। এভাবে জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধির কারণে এদেশে কতগুলো ‘লেসার জব’-এ কাজ করতে হচ্ছে মুসলমানদের।

শু এই যে কুসংস্কারের কথা বললেন। এর কোনও বিশেষ দিক উল্লেখ করবেন?

প্ত কুসংস্কার মানে তাদের ওপর ধর্মের প্রভাব খুব বেশি। এই যে স্থানীয় পীর, মোল্লা যারা আছে...গত তিন বছর ধরে একটা বীভৎস জিনিস নিয়ে আমি লড়াই করছি। সাবিনা বলে একটা মেয়ে, তার বাবার সঙ্গে হাওড়া জেলার অন্তর্গত বাগনান থানাভুক্ত একটা জায়গায় থাকে। তারা চারটি ভাই, একটি বোন। সাবিনা উচ্চমাধ্যমিক পাশ। তো সাবিনার একবার চর্মরোগ ধরা পড়ল।

(এরপর ১৩ পাতায়)

"মুসলিম সংরক্ষণ"

রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের সুপারিশ কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছে। কমিশনের সুপারিশে মুসলিমদের জন্য চাকরিতে ১০ শতাংশ সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে কেন্দ্রিয় সরকার এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি এবং ওই কমিশনের রিপোর্ট সংবাদে পেশ করা হয়নি। হঠাৎ গত ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ পশ্চিম-বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী অসাংবিধানিক পদ্ধ তিতে মুসলিমদের অনগ্রসর শ্রেণীর আওতায় এনে তাদের জন্য 'ও.বি.সি. মুসলিম' নামে একটি ক্যাটাগরি চালু করে মুসলিমদের জন্য সরকারী চাকরীতে ১০ শতাংশ সংরক্ষণের কথা ঘোষণা করলেন। আসল উদ্দেশ্য হলো আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনে মুসলিমদের ভোট বামফ্রন্টের অনুকূলে আনার নগ্ন প্রয়াস। বামফ্রন্টের ৩৩ বছরের রাজত্বে এই রাজ্যে মুসলিমদের করুণ অবস্থার চিত্র সাচার কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ায় বামফ্রন্টের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। মুসলিম সম্প্রদায়ের 'দুর্দশা' ঘোচাতে বুদ্ধ বাবুর সরকার যে যথেষ্ট, সেই 'বার্তা' মুসলিমদের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন।

চিঠিপত্র

প্রশ্ন হলো—ভারতের শাসনব্যবস্থা কি শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য? তফসিলি জাতি, উপজাতি এবং ও.বি.সি.-র জন্য কতদিন সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু থাকবে? সাধারণ ক্যাটাগরি-র জন্য পদ বা আসন সংরক্ষিত হবে না কেন? রাজ্যে মোট সংরক্ষণ এখন ৩৫ শতাংশ, হবে ৪৫ শতাংশ, তফসিলি জনসংখ্যা ২২ শতাংশ এবং সংরক্ষণ—২২ শতাংশ, তফসিলি উপজাতি জনসংখ্যা—৫.৫ শতাংশ এবং সংরক্ষণ—৬ শতাংশ এবং ও.বি.সি. সংরক্ষণ—৭ শতাংশ। এ রাজ্যে মুসলিম জনসংখ্যা—২৫.২৫ শতাংশ। ও.বি.সি. অন্তর্ভুক্ত ১২টি মুসলিম সম্প্রদায় আছে, চাকরিতে তাদের জন্য সংরক্ষণ ১০ শতাংশ। আমাদের দাবী প্রকৃতপক্ষে যারা গরীব বা খুবই অনুন্নত—সে যে ধর্মেরই হোক না কেন তাদের জন্য পদ সংরক্ষিত হোক। মুসলিম ও তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে অনেক ধনী-বণিক শ্রেণী আছে তাদেরকে বাদ দিতে হবে এবং সত্যিকারের যারা গরীব তাদের জন্য সংরক্ষণ হোক। মুসলিম তোষণ বন্ধ হোক। বি.জে.পি. নয়, সিপিআই(এম) প্রকৃতপক্ষে বাম সাম্প্রদায়িক দল বলে চিহ্নিত হোক।

—অধ্যাপক আশিস রায়, বি.গার্ডেন, হাওড়া-৩

॥ ২ ॥

বর্তমান কালে ভারতব্যাপী বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চ ল বা সেজের রূপায়ণে নতুন দুর্দশার সৃষ্টি হয়েছে—খাদ্যাভাব ও কর্মের অভাবের মধ্য দিয়ে। এরসঙ্গে নতুন করে যুক্ত হয়েছে ওবিসি বা অন্যান্য পশ্চাদপদ জাতি ও সংখ্যালঘু বিশেষত মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ।

এই সংরক্ষণের ফল—অসংরক্ষিত ভারতবাসীর জাতীয় আয়ের কিছু অংশ সংরক্ষিতদের জন্য ব্যয়। জাতিকে সংরক্ষিত ও অসংরক্ষিত এই দুভাগে ভাগ করে জাতীয় একতা বিনষ্ট করা। অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে যে প্রতিভার সৃষ্টি হয় তাতে বাধা সৃষ্টি করে বিশেষ গোষ্ঠীর একদল মানুষকে সত্বর বড়লোক বানিয়ে দেবার প্রচেষ্টা।

তাই সকল দেশভক্তদের কাছে আবেদন, আপনারা এর প্রতিবাদ করুন। এই ধরনের সংরক্ষণের পরিবর্তে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমাজকল্যাণমূলক প্রকৃত অভাবী প্রতিভাধর ছাত্রবৃত্তি চালু করুন। অন্যান্য সামাজিক অর্থনৈতিক শিক্ষা ও ট্রেনিং প্রকল্প চালু হোক্ যার দ্বারা পাকাপাকিভাবে উন্নয়ন আসবে।

—অমরনাথ দে, কলকাতা-৯।

অল ইজ ওয়েল

ভারতবর্ষে থ্রি-ইডিয়টস্ মুক্তি পাওয়ার পরই সুপার হিট। সবাই এখন 'অল-ইজ-ওয়েলে' মগ্ন। মূল্যবৃদ্ধি, সন্ত্রাসবাদ, ইসলামী লাভ জেহাদ সমস্ত বাড়ছে, কিন্তু যুবসমাজ নিরুত্তাপ। অল-ইজ-ওয়েল-এর হাওয়া চারদিকে। ইংরাজী পাশাপাশি, হিন্দুত্বের অপমান প্রচারিত হচ্ছে সিনেমায়। তাও অল-ইজ-ওয়েল। কোনও প্রতিবাদ নেই সমাজ থেকে। সিনেমায় হিন্দু সেন্টিমেন্ট নিয়ে ছেলেখেলা করা হলো তবুও আমরা নিশ্চু প। সকলে পরীক্ষাপাশের জন্য দেব-দেবীদের কাছে প্রার্থনা জানালে ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড 'শ রুপিয়া মে তো ট্রাফিক পুলিশ ভি নেহী মানতা, তো ভগবান কোনসা...', কোথাও শোনানো হলো, 'ভগবান দেখানো কো সুপারি দে রহে কেয়া?' সত্যি সুন্দর এই শিল্পী-স্বাধীনতা। কিন্তু দেখান হলো না আল্লা বা যীশুর প্রতি কোনও ছাত্রের অন্ধবিশ্বাস। অথচ মৃত ব্যক্তির অস্থি পায়খানায় ফেলতে যাওয়ার নাটক দেখানো হলো সিনেমায়। দেখানো হলো হিন্দু বন্ধুর বোনকে মুসলিম বন্ধুর বিয়ের প্রস্তাবে হিন্দু ছেলেটির আনন্দ, কিন্তু কোনও ভাবেই একবারও দেখান হলো না কোনও মুসলিম বা খৃস্টানদের কোনও আপত্তিকর ঘটনা। 'বিসর্জন' শব্দটিকে কলুষিত করা হলো বিকৃত ব্যবহারে। অর্থাৎ এককথায় অতি সুকৌশলে হিন্দু-বিশ্বাস ও হিন্দু-সহনশীলতাকে আঘাত করা হলো সিনেমায়। তা সত্ত্বেও দেশের আপামর হিন্দু সমাজ নিশ্চু প। 'অল-ইজ-ওয়েল'। কিন্তু আর কতদিন চলবে এই অপমান?

—রাজু হালদার, জামালপুর, বর্ধমান।

চায়না ডাক্তার

বামফ্রন্ট সরকারের সর্বশেষ কীর্তির কথা পত্র-পত্রিকা মারফৎ জানতে পেরে বড়ই অদ্ভুত অনুভূতি হলো। আমাদের রাজ্য সরকার গ্রামের মানুষের চিকিৎসার জন্য তিন বছরের ডিপ্লোমা নেওয়া ডাক্তার তৈরি করতে চাইছেন। এর জন্য তারা বিল পেশ করিয়েছেন। বর্তমানের ডাক্তারবাবুরা সকলে শহরে থাকতে চান। কেউ গ্রামের গরিব মানুষের চিকিৎসা করতে চান না। কারণটা খুবই সহজ। শহরে রয়েছে অগাধ অর্থ উপার্জনের নানারকম পন্থা। প্রাইভেট চেম্বার, বেসরকারি নার্সিংহোম, প্যাথলজি থেকে ওষুধ-কোম্পানিগুলির নানারকম উপঢৌকন। অন্যদিকে গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষজন অর্থনৈতিকভাবে গরিব। তাদের চিকিৎসার একমাত্র উপায় সরকারি-হাসপাতাল। কিন্তু হাসপাতালে শুধু চলছে 'নেই' এর রাজত্ব। ডাক্তার নেই, কখনও নার্স নেই, কখনও ওষুধ নেই। যে সরকার গ্রামের মানুষের উন্নয়ন তথা গরিব মানুষের পাশে থাকার কথা বলে তারা এ ব্যাপারে কোনও উপযোগী কাজ করতে পারল না। শাসক দলের নেতাদের জন্য কোটি টাকা খরচ করে বিদেশের ডাক্তারদের চিকিৎসা গ্রহণ করে। আর গ্রামের মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য সস্তার হাফ ডাক্তার নিয়োগ করতে চায়। এখন বাজার দোকান করতে গেলে বিভিন্ন ধরনের সস্তা জিনিসপত্র পাওয়া যায় সেগুলি দামে অত্যন্ত কম, দেখতে প্রচণ্ড চটকদারি, কিন্তু গুণমানের দিক সেগুলো অত্যন্ত খারাপ। এগুলির নাম হয়েছে 'চায়না মাল', যার কোনও গ্যারান্টি নাই। আর ক'দিন পর পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের হাসপাতালে এই 'চায়না ডাক্তার' বাবুরা থাকবেন। চেম্বারের বাইরেতে লেখা থাকবে—চায়না ডাক্তারবাবু, সুচিকিৎসার কোনও গ্যারান্টি নেই। বাম রাজত্ব যুগ যুগ জিও।

—বাপন দত্ত, কলকাতা-৬

পৃথক তেলেঙ্গানা

ধীরেন দেবনাথ

জনমত

কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্যের দাবি মেনে নিতেই কয়েকটি রাজ্যে রাজ্যভাগ তথা পৃথক রাজ্যের দাবি উঠেছে। আর এই দাবি উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, জম্মু-কাশ্মীর, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে। তবে ওই সব রাজ্যে এই দাবি এই প্রথম নয়, বরং বহুদিনের। কিন্তু অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানাকে পৃথক রাজ্যের স্বীকৃতি দানের কথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদম্বরম ঘোষণা করতেই পৃথক রাজ্যের দাবিদাররা নিজেদের দাবিতে হয়েছেন আরও সোচ্চার। অর্থাৎ তাঁদের দাবির জলন্ত আগুনে পড়েছে ঘৃতাহুতি। যদিও পৃথক রাজ্যের দাবি সরকার মেনে নিতেই কয়েকটি রাজ্যে যেভাবে পৃথক রাজ্যের দাবি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তাতে শুধু রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহলই নয়, প্রত্যেক জাতীয়তাবাদী ভারতবাসী বিস্মিত, উদ্বিগ্ন ও সন্দিহান। এসবের কারণও অবশ্য আছে। এমনিতেই ভারত আজ সন্ত্রাসবাদ, মৌলবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের শিকার। ঘরে-বাইরে সক্রিয় দেশের শত্রুরা। জম্মু-কাশ্মীর এবং উত্তর পূর্বাঞ্চ লের কয়েকটি রাজ্যে ভারতবিরোধীরা দীর্ঘদিন ধরে চালাচ্ছে স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবিতে সশস্ত্র সংগ্রাম ও ধবংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ। আর এ কাজে তারা নৈতিক, আর্থিক ও সামরিক সাহায্য বা মদত পাচ্ছে প্রতিবেশি কয়েকটি রাষ্ট্রের কাছ থেকে।

এমতাবস্থায় রাজ্যে রাজ্যে পৃথক রাজ্যের দাবির মধ্যে দূরদর্শী মানুষজন দেখছেন 'সিঁদুরে মেঘ'। ভারতের অখণ্ডতা ও ভবিষ্যৎ নিয়েই তাঁরা এখন চিন্তিত।

একদা ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল কয়েকশত দেশীয় রাজ্য। সেগুলির অধিকাংশই যোগ দিয়েছে স্বাধীন ভারতের সঙ্গে এবং কিছু কিছু রাজ্যের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে বড় বড় রাজ্য। বৃহত্তর আসাম ভেঙেও হয়েছে মেঘালয়, অরুণাচলপ্রদেশ, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, মিজোরাম প্রভৃতি রাজ্য। এই রাজ্যগুলিও গঠিত হয়েছে জাতি, ভাষা ও পরোক্ষভাবে ধর্মের ভিত্তিতে। প্রশাসনিক কারণতো ছিলই। কিন্তু কয়েক দশক পরে দেখা গেল, আসাম, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, মিজোরাম প্রভৃতি রাজ্যে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের দাবিতে বিদেশের মদত পুষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদীরা সশস্ত্র জঙ্গি আন্দোলন ও অন্তর্ঘাতমূলক ক্রিয়াকলাপে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

বেশ কয়েক বছর আগে প্রশাসনিক অসুবিধা, উন্নয়নহীনতা, বঞ্চ না প্রভৃতির ধুয়ো তুলে ক্ষমতালোভী রাজনৈতিকরা সহিংস আন্দোলন ঘটিয়ে আদায় করে নিতে সক্ষম হয়েছেন ঝাড়খণ্ড, উত্তরাখণ্ড ও ছত্তিশগড় রাজ্য। কিন্তু প্রশ্ন, এতদিনেও এইসব নবগঠিত রাজ্যে কী উন্নয়নের জোয়ার বইছে? সাধারণ মানুষ বঞ্চ নার জাঁতাকল থেকে কী পেয়েছে মুক্তি? না, হয়নি কোনটাই। কারণ সরকারে ক্ষমতাসীনরা উন্নয়ন ও সাধারণ মানুষের বঞ্চ নার কথা ভুলে এতদিন শুধু নিজেদের আখেরই গুছিয়েছেন—পান করেছেন ক্ষমতার মধু। এই ঝাড়খণ্ডের কথাই ধরা যাক। ওই রাজ্যে যাঁরাই ক্ষমতাসীন হয়েছেন তাঁদের অনেকেই জড়িয়ে পড়েছেন আর্থিক দুর্নীতিতে। আদালতে তাঁরা অভিযুক্ত। কাজেই পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠিত হলে সে রাজ্যে যে উন্নয়নের বন্যা বয়ে যাবে বা বঞ্চ নার অবসান ঘটবে তা ভাবার কোনও কারণ নেই। বরং আর্থসামাজিক অবস্থা যে তিমিরে রয়েছে সেই তিমিরেই রয়ে যাবে। চন্দ্রশেখর রাও যদি তেলেঙ্গানাকে ভালোইবেসে থাকেন, সাধারণ মানুষের দুঃখে তাঁর প্রাণ কেঁদেই ওঠে তাহলে তাঁর অনশনই তো তেলেঙ্গানা সমস্যার সমাধান ঘটাতে পারতো। তার জন্য পৃথক রাজ্যের দাবি কেন? আসলে তিনিও উচ্চাভিলাষী, ক্ষমতালোভী। ক্ষমতার মধু পান করতেই তাঁর এই অনশন। আর এক ক্ষমতালোভী নেত্রী ও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে উত্তরপ্রদেশকে ভেঙে তিনটি নতুন রাজ্য গঠনের দাবি জানিয়েছেন। আশ্চ র্যের বিষয় এই যে, মায়াবতী একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়েও সেই রাজ্যকে ভাঙতে চাইছেন। ইতিপূর্বে এমন ঘটনা ঘটেনি। তিনিও অবশ্য দুর্নীতির পঙ্কে নিমজ্জিত। তাঁর বিরুদ্ধে ও মামলা। ঘোলাজলে মাছ ধরতে নেমেছেন তিনিও।

পৃথক রাজ্যের দাবি উঠেছে এ রাজ্যেও। গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা, কামতাপুরী ও গ্রেটার কোচবিহার-এর ক্ষমতালোভী রাজনৈতিকরা পৃথক রাজ্যের দাবি জানিয়ে আসছেন দীর্ঘদিন ধরে। তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনের ঘোষণায় তাঁরাও উজ্জীবিত। গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার বিমল গুরুং-রোশন গিরিরা পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে চালাচ্ছেন আন্দোলন। ইতিপূর্বে ওই একই দাবিতে সহিংস আন্দোলন করেছেন সুবাস ঘিসিং। কিন্তু রাজ্যের পরিবর্তে তিনি পেয়েছেন অটোনমাস হিল কাউন্সিল। দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসেবে দার্জিলিংয়ের উন্নয়নে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পেয়েছেন অঢেল টাকা। কিন্তু কোথায় গেল সেই টাকা। দার্জিলিংয়ের উন্নয়ন তো হয়ইনি, উল্টে রাস্তাঘাট হয়েছে আরও ধবংস-পাহাড়বাসীর দুর্দশা বেড়েছে বৈ কমেনি। 'ঘিসিং অ্যান্ড কোম্পানী'র পান্ডারা হয়েছে কোটিপতি। ক্ষমতালোভী বিমল গুরুংরাও যে সেই পথে হাঁটবেন তাতে আর সন্দেহ কী? তাছাড়া দার্জিলিং আর্থিকভাবে অনগ্রসর। শুধু চা বিক্রি করে একটা রাজ্য চলতে পারে না। উপরন্তু এটি সীমান্তবর্তী অঞ্চ ল। চীন আজও দার্জিলিংকে নিজের এলাকা বলে দাবি করে। তাই ভবিষ্যতে এখানে চীনের মদতে বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে।

তাই কেন্দ্রীয় সরকারকে এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বার্থে ভাষা, ধর্ম, জাতি ও রাজনীতির ভিত্তিতে কোনও পৃথক রাজ্য গঠন করা চলবেনা। পৃথক রাজ্য গঠনের একমাত্র ভিত্তি হবে প্রশাসনিক সুবিধা ও উন্নয়ন।

ব্যাঙ্গালোরে সেবা সঙ্গম

সেবিতকে সেবক বানানোই সেবা — শ্রীভাগবত

সংবাদদাতা ॥ ব্যাঙ্গালোরের কাছে নীতি মীনাক্ষী ইনস্টিউট অফ টেকনোলজিতে গত ৬, ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হলো সেবা সঙ্গম। সারা দেশের প্রতিটি রাজ্য থেকে প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিলেন।

৩৯টি প্রান্তের (সঙ্ঘ যোজনা) ৪০৭টি সংস্থা থেকে ৭৪ জন মহিলা সহ মোট ৯২৮ জন প্রতিনিধি এবং ব্যবস্থাপনায় আরও ৩০০ জন অর্থাৎ প্রায় ১২০০ জন উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের ১৩ জন প্রতিনিধি অংশ নেন। সঙ্গমের প্রবেশ দ্বারের বাঁদিকে সমগ্র দেশের সেবা কাজের চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনী সকলকে আকৃষ্ট করে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রস্তাবনায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ-সেবা প্রমুখ সুহাসজী হীরেমঠে বলেন, পবিত্রতা, বিশালতা এবং সমরসতা এই সঙ্গমের উদ্দেশ্য আর এটা স্মরণ করানোর জন্যই এই সঙ্গম।

আর্ট অফ লিভিং-এর সংস্থাপক পূজ্য রবিশংকরজী এবং নিবর্তমান সরসঙ্ঘচালক সুদর্শনজী 'পরিবর্তন' নামক স্মারিকার উন্মোচন করেন।

পূজ্য রবিশংকরজী আশীর্বাদ দিয়ে বলেন সেবা, সাধনা ও সৎসঙ্গ এই তিনটিকে নিয়ে চললে জীবনে উৎসাহ আসে। রবিশঙ্করজী বক্তব্য—"কোনও কিছু পাবার আশা না করেই সেবা-ধর্ম পালন করা উচিত। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যা যা প্রয়োজন, ভগবান তার সবই আমাদের দিয়েছেন। কিন্তু এর বিনিময়ে তিনি আমাদের কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করেন না। ঠিক একইভাবে পীড়িতদের কাছ থেকে কোনও কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা না করেই আমাদের সেবাধর্ম পালন করা উচিত।"

ব্যাঙ্গালোরে সেবাসঙ্গম-এর উদ্বোধন করছেন মদনদাসজী।

সুদর্শনজী জোর দিয়েছেন হিন্দু সমাজ থেকে হীনমন্যতা দূরীকরণের ব্যাপারে। তিনি বলেছেন—হিন্দু সংস্কৃতি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে নারায়ণকে দেখতে শিখিয়েছে। তিনি আরও বলেন, 'সেবার মধ্যে আপনত্ব চাই।' শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী রামতীর্থ ইত্যাদি উদাহরণ-এর মাধ্যমে তিনি সেবার আপনত্ব ব্যক্ত করেন।

অখিল ভারতীয় সেবা প্রমুখ সীতারামজী কেদিলাই বলেন, আমাদের উদ্দেশ্য সমাজের পরিবর্তন, পরিবর্তনের দু'টি দিক—(১) পতন-এর জন্য কোনও সাধনার প্রয়োজন নেই। আপনি হয়ে যায়। (২) উত্থান-এর জন্য সাধনার প্রয়োজন। এর নামই সেবা। সেবা আমাদের জীবনের সাধনা।

সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত স্বামী বিবেকানন্দের বাণীকেই প্রতিধ্বনিত করে শ্রোতৃবর্গকে স্মরণ করিয়ে দেন—"আমাদের কর্তব্য সমাজকে সমৃদ্ধ করা। যদি সাধারণ মানুষ ক্ষুধার্ত ও নিরক্ষর থাকেন তবে আমাদের প্রধান কর্তব্য হবে তাদের জীবনধারণের জন্য মর্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে কোনও জীবিকার বন্দোবস্ত করে দেওয়া। এবং এই জিনিসটা একমাত্র সেবা-র মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে।" তিনি সেবা প্রসঙ্গে বলেন, সঙ্ঘের কার্যপদ্ধতির অঙ্গ সেবা বিভাগ। সেবার দ্বারাই সকলকে স্বাবলম্বী বানানো। মতান্তর করাটাও সেবা। তিনি বলেন—আমাদের সেবা হচ্ছে সেবিতকে সেবক বানানো। সঙ্ঘের সেবা কাজের মূল্যাঙ্কন করে সকলকে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

আর এস এসের সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী বলেন, কতগুলো প্রকল্প আমরা চালাচ্ছি, সেটাকে বিচার্য না করে বরং কতগুলো প্রকল্প সঠিকভাবে রূপায়িত হচ্ছে এবং সেই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে আমরা সমাজের কাছে কতটা সেবামূলক কাজ পৌঁছে দিতে পারছি তাই বিচার্য হওয়া উচিত।

পুরীতে মহাসংকীর্তন যাত্রার সমাপ্তি

হিন্দু ধর্মে বিধি-নিষেধ আরোপ হচ্ছে ঃ সিংঘল

পুরীতে যাত্রার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অশোক সিংঘল ও অন্যান্য সন্তরা।

নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ হিন্দু সমাজ আজ সুরক্ষার অভাবে ভুগছে। ১৫ হাজার মঠ মন্দির সরকারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। হিন্দুধর্ম আচার-আচরণে প্রতি মুহূর্তে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হচ্ছে, অথচ বহু বে-আইনীকাজে যুক্ত চার্চ ও মসজিদকে সরকার স্পর্শ করতে পারছেনা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীক্ষেত্র আগমনের ৫০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে পুরীর সরদাবালীতে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অধ্যক্ষ অশোক সিংঘল একথা বলেন। তিনি আরও বলেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতো সমাজ জাগরণের আজ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। দিকে দিকে হিন্দু ধর্মগুরুদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, স্বামী লক্ষ্মণানন্দজীর মতো সন্তকে হত্যা করা হয়েছে, গঙ্গানদীর অবিরলধারা বন্ধ করা হচ্ছে, রামসেতুর উপর কুঠারাঘাত করা হচ্ছে। এ সবের পেছনে দিল্লীতে অধিষ্ঠিত এক মহিলার হাত রয়েছে বলে তিনি কটাক্ষ করেন। সরকার নাস্তিকের মতো আচরণ করছে। শ্রীসিংঘল আরও বলেন, সমস্ত মঠ-মন্দির, ধর্মাচার্যদের সংগঠিতভাবে এর প্রতিবাদ করতে হবে। স্বামী প্রজ্ঞানন্দ মহারাজ বলেন, ভারতবর্ষ ত্যাগের দেশ। নাম যশের প্রতি আকর্ষণ সমাজকে বিপথে পরিচালিত করছে বলে তিনি বলেন। কলকাতা থেকে আগত পরাশর রামানুজ মহারাজ বলেন, কলিযুগে নাম সংকীর্তন একমাত্র মুক্তির পথ। কেবল ব্যক্তিগত নয় মিলিতভাবে নাম করাকে বলা হয় "সংকীর্তন"। আজ মহাপ্রভুর সেই নাম সংকীর্তনের আবশ্যকতা রয়েছে। গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি বিকাল ৩টায় পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সামনের প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয় মহাসংকীর্তন যাত্রা। হাজার হাজার ভক্ত কীর্তনীয়া হরিনাম সংকীর্তন করতে করতে গুন্ডিচাবাড়ী সরদাবালীতে একত্রিত হয়। অনুষ্ঠিত সভায় জগন্নাথ অষ্টকম্ পরিবেশন করেন সোমনাথ নন্দী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রশান্ত পন্ডা।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, গত ১৯ জানুয়ারি ২০১০ কাটোয়ার গৌরাঙ্গবাড়ী থেকে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস যাত্রাকে স্মরণ করে এই সংকীর্তন যাত্রার শুভ সূচনা হয়। যাত্রার সূচনা করেন প্রবীণ তোগাড়িয়া। মহাপ্রভু যে পথ ধরে কাটোয়া থেকে নীলাচলের পথে যাত্রা করেছিলেন, ৫০০ বছর পরে সেই পথ ধরে শ্রীক্ষেত্র পুরীধাম পর্যন্ত সংকীর্তন যাত্রার আয়োজন করেছিল "শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত হরিনাম প্রচার সমিতি"। ২৮ দিনের এই পরিক্রমায় ছিল চার চারটি ট্যাবলো, ১২টি বাহন, ১২৫ জন কীর্তনীয়া এবং ৫০০ জন ভক্ত। ৬৭২ ঘণ্টা চলেছিল অখণ্ড কীর্তন। যাত্রা পথে ৩৬টি বড় সমাবেশ হয় এবং উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন মঠমন্দিরের সন্ত ও সজ্জনবৃন্দ। বাংলা এবং ওড়িশার মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল এই যাত্রার বিভিন্ন অনুষ্ঠান। তাই শেষ হয়েও যেন 'না হইল শেষ'।

কাটোয়ায় যাত্রার সূচনায় প্রবীণ তোগাড়িয়া।

অঙ্গনা

বিশ্বায়ন ও ভারতীয় নারী সমাজ

পারুল মণ্ডল

বিগত প্রায় পনেরো বছর ধরে সমগ্র বিশ্বে একটি শব্দ ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে তা হল "বিশ্বায়ন" বা Globalization। এই বিতর্কিত শব্দটির অর্থ নানা ভাবে ব্যাখ্যা করা হলেও প্রচলিত অর্থে বর্তমান যুগে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে সভ্যতা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, জীবনযাত্রা শৈলীর ক্ষেত্রে যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বেড়েছে, তা বোঝাতেই বিশ্বায়ন শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এই বিশ্বায়নের ফলে সবথেকে বেশী প্রভাবিত হয়েছে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলি।

উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা বিশ্বায়ণের ফলে সব থেকে বেশী প্রভাবিত। যেহেতু যেকোনও দেশের অর্থনীতি সেই দেশের সমাজব্যাবস্থাকে ব্যাপকরূপে প্রভাবিত করে, তাই বিশ্বায়নের যুগে অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন সমাজব্যবস্থাকেও যথেষ্ট পরিবর্তিত করেছে। ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব গত দশ-পনেরো বছরের মধ্যে ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে ব্যাপক বিদেশী প্রভাব তৈরি হয়েছে এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলি নদীর স্রোতের মতো ভারতের বাজার দখল করেছে, তার প্রভাব থেকে ভারতীয় সমাজও মুক্ত নয়। ভারতীয় সমাজের প্রায় সর্বক্ষেত্রে এই বিশ্বায়নের প্রভাব পড়লেও এর ফলে সব থেকে বেশী প্রভাবিত বোধহয় আমাদের জীবনযাত্রার ধারা ও নারী সমাজ।

বিশ্বায়নের ফলে অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে যে পরিবর্তনগুলি ঘটেছে সেগুলি হলো—মানুষের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও তথ্যপ্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি তথা এই সমস্ত উন্নতির ফলে পরিবর্তিত জীবনযাত্রাকে মানুষ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে।

পৃথিবীতে দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ জনসংখ্যাবহুল দেশ ভারতবর্ষের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মহিলা। স্বাভাবিক ভাবেই বিশ্বায়নের প্রভাব থেকে ভারতের নারী সমাজ কোনভাবেই বাদ থাকতে পারে না। বিগত কিছু বছর ধরে ভারতের সমাজে নারীদের মধ্যে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বনির্ভর হওয়ার উদ্যোগ দেখা দিয়েছে। বহুজাতিক সংস্থাগুলিতে মহিলা কর্মীদের সংখ্যা আগের থেকে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মেয়েরা আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর করার জন্য ও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে কোনও শর্তে এই সমস্ত বহুজাতিক সংস্থাগুলিতে ও অসংগঠিত শিল্পে কর্মরত। এই কর্মরত মহিলাদের আর্থিক স্বয়ম্ভরতা যদিও বেড়েছে তথাপি তাদের জীবনযাত্রার ধরনও পাল্টে ছে। আর্থিক স্বয়ম্ভরতার সাথে ঐতিহ্যকে অগ্রাহ্য করা বা পারিবারিক সংস্কৃতির কোনও দ্বন্দ্ব নেই এটা আমরা প্রায় ভুলতেই বসেছি।

বিশ্বায়নের ফলে পরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে যাওয়া, ডিভোর্সের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া, নতুন পরিবেশের সাথে মানিয়ে না নিতে পারার মতো সমস্যা অত্যন্ত ভয়াবহ রূপে বিস্তার করেছে। এই সমস্ত সংস্থাগুলিতে যে হারে কাজের চাপ দেওয়া হয়, সেই কাজের চাপের সাথে সাথে পারিবারিক দায়িত্ব নির্বাহ করা তাদের পক্ষে একরকম অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তাই দিনে দিনে বিশেষ করে দেশের বড় বড় শহরগুলিতে সমাজের মূল একক পরিবার ব্যবস্থা এক বিরাট প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে।

একথা যদিও সত্য যে বিশ্বায়নের বিবিধ কুপ্রথা দেশের বড় বড় শহরগুলির জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু একথাও কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না যে, বিশ্বায়নের ফলেই হয়ত শহরের এই নারীসমাজ, প্রচলিত সীমিত গন্ডী থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। হয়ত একথা স্বীকার করতে কষ্ট হবে, কিন্তু এটা সত্যি যে নারীদের প্রতি কুসংস্কার ও কুনীতি ভারতে পূর্ণরূপে বিরাজ করছে ও আমাদের সমাজের কোনও অংশই এই রীতির বাইরে নেই। কিন্তু শহরের আর্থিকরূপে স্বয়ম্ভর এই নারীসমাজ এই সমস্ত কুনীতি থেকে মুক্ত হতে পেরেছে ও কুপ্রথাগুলিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে সক্ষম হয়েছে।

এবার যদি আমরা ভারতের গ্রামাঞ্চলের চিত্র দেখি তাহলে দেখব যে গ্রামীণ অঞ্চলে কর্মরত মহিলাদের মধ্যে ৮৭ শতাংশ মহিলাই কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত। বিশ্বায়নের কোনও প্রভাবই এই অঞ্চলের মহিলাদের উপর পড়েনি। বর্তমান ভারতবর্ষে একশ্রেণীর মহিলাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও পরিবার ব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করা অবশ্যই বড় সমস্যা। কিন্তু এই সমস্যা সীমিত বড় বড় শহরের একশ্রেণীর মহিলাদের মধ্যে। কিন্তু আমাদের দেশে নারীদের প্রতি তার থেকেও বড় ও ভয়াবহ সমস্যা এখনও বর্তমান, যেমন পণপ্রথা, কন্যা ভ্রূণ হত্যা, বাল্যবিবাহ, শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে নানারকমভাবে মেয়েদের পঙ্গু করে দেওয়া থেকে কিন্তু আমাদের দেশ এখনও মুক্ত নয়। আর এই সমস্ত সমস্যা সব থেকে বেশি দেশের গ্রামাঞ্চলে।

শুধুমাত্র কেতাবী শিক্ষা মানুষের মানসিকতা পরিবর্তন করাতে কতটা সক্ষম সেটা বির্তকের বিষয়। আবার হিন্দুশাস্ত্রে নারীদের যতই মাতৃরূপে, শক্তিরূপে পূজা করা হোক না কেন বাস্তবে নারীদের অবস্থান আমাদের সমাজে কোথায় তা বলাই বাহুল্য। তাই আদর্শগত দিক থেকে নষ্ট নারীদের মুক্তি অবশ্যই হতে হবে বাস্তব ভিত্তিতে। আর একাজ করতে হবে নারীদেরই। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন ভারতে নারীদের মুক্তি তখনই সম্ভব যখন নারীরা নিজেদের স্বাধীনতার লড়াই নিজে লড়বেন।

বিশ্বায়ন আমাদের দিগন্তকে বহুদূর বিস্তৃত করেছে। আমরা মহিলারা এই সুবর্ণ সুযোগকে এখনই সম্পূর্ণরূপে নিজেদের জীবনযাত্রাকে উন্নত করার ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারব, যখন বিশ্বায়ন আমাদের সামনে নিজেদের দক্ষতাকে সবার সামনে তুলে ধরার যে সুযোগ দিচ্ছে, যেই সুযোগের সদ্ব্যবস্থা করব এবং তার সুফলকে নিজেদের পরিবার ও সমাজের মানসিকতা পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে কাজে লাগাব। বিশ্বায়ন থেকে স্বেচ্ছাচারিতার আদর্শ নয়, স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার আদর্শ নারীসমাজ যখন গ্রহণ করবে সেদিনই ভারতীয় নারীদের সার্থক প্রগতির ধারা প্রবাহিত হবে।

আগামী সপ্তাহে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারীদিবস। এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে সমাজে নারীদের অবস্থান কোন পর্যায়ে—এ প্রসঙ্গে এই নিবন্ধটি প্রকাশিত হল।ব

।। চিত্রকথা ।। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।। ১

দোলনায় শিশু নিমাইকে কাঁদতে শুনে মেয়েরা ছুটে এসে কীর্তন করত। আর এতেই সে কান্না ভুলে হেসে উঠত।

নামকরণের দিনে থালায় সাজানো সব জিনিসের মধ্যে সে শুধু শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থটিই আঁকড়ে ধরল।

একদিন সবাই বিস্মিত হয়ে দেখল, নিমাই একটা কেউটে সাপের সঙ্গে খেলা করছে। কিছুক্ষণ পর সাপটা অবশ্য চলে গেল।

আই এফ টি ই-র বার্ষিক সভা

দীপক গাঙ্গুলী॥ আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির সহায়ে ক্ষুদ্র তথা লঘু উদ্যোগের বিকেন্দ্রীকরণই প্রকৃত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি বলে মন্তব্য করলেন স্মল এন্ড মাইক্রো মিডিয়াম এন্টারপ্রাইস-এর রাজ্য মন্ত্রী দিনশা প্যাটেল। ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অফ টিনি এন্টার-প্রাইসেস (IFTE)-এর উদ্যোগে আয়োজিত "নিড টু রেডিফাইন কনসেপ্ট অব মাইক্রো স্মল মিডিয়াম এন্টারপ্রাইসেস সেক্টর টু রি-স্ট্রাকচার ইটস সাপোর্ট সিস্টেম' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে এসে তিনি এই মন্তব্য করেন। কলকাতা নেতাজী সুভাষ রোড স্থিত বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সভাঘরে অনুষ্ঠিত গত ১০ ফেব্রুয়ারির এই আলোচনা সভায় প্রায় একশো লঘু উদ্যোগীর সামনে শ্রী প্যাটেল আরও বলেন যে, এই ধরনের উদ্যোগ অর্থনৈতিক সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ। অঞ্চল বা এলাকা ভিত্তিক এই ধরনের ক্ষুদ্র প্রয়াস জাতীয় অর্থনীতিকে মজবুত কাঠামোর উপর একদিকে যেমন দাঁড় করাবে, অন্যদিকে তা কর্মসংস্থান এবং প্রাণবন্ত বাজার তৈরিতেও সক্ষম হবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এডিশনাল চিফ সেক্রেটারি ডঃ এ কে চন্দা ক্ষুদ্র উদ্যোগের সমস্যা নিয়ে আলোকপাত করেন। একই বিষয় নিয়ে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেন এস আই ডি বি আই ব্যাঙ্কের পূর্বাঞ্চলের চিফ জেনারেল ম্যানেজার কে এস সিংহাবন, ভারত সরকারের এম এস এস ই বিভাগের এডিশনাল ডেভেলপম্যান কমিশনার সমরেন্দ্র সাহু। আলোচনা চক্রে লঘু উদ্যোগের একাধিক সংস্থাসহ দ্য মাল্টি স্টেট লঘু উদ্যোগ আর্বান কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের চিফ অ্যাডভাইসর গোপাল বিশ্বাস, আই এফ টি ইর সেক্রেটারি জেনারেল বি এল বেহাতি, চেয়ারম্যান এস এস থাঙ্গানারিয়া, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষ বাগরোডিয়া প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলা তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে শ্রীপ্যাটেল এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সহায়তায় আশ্বাস দেন।

সমাবেশ সমাচার

ঝামাপুকুর রামকৃষ্ণ সংঘের বার্ষিক মহোৎসব

গত ১৬ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি দিগম্বর মিত্রের রাজবাড়ীতে "ঝামাপুকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সংঘের" একত্রিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উৎসব সংঘ সভাপতি অক্ষয় মিত্রের পৌরোহিত্যে এবং সম্পাদক প্রতাপ মিত্রের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কর্মসচিব ভানু সরকার। বিভিন্ন দিনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, জগন্মাতা সারদাদেবী ও বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও অমর বাণী সম্বন্ধে ভাষণ দেন স্বামী শিবময়ানন্দজী মহারাজ, নিত্যমুক্তানন্দ, গিরিজানন্দ, সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, ডঃ কমল নন্দী, ডঃ দিপালী রায়, অধ্যাপক অমলেন্দু চক্রবর্তী, অধ্যাপক দীপক গুপ্ত, পার্থসারথি গোস্বামী, প্রব্রাজিকা জপপ্রাণা, অমলাপ্রাণা ও সূচীপ্রাণা মাতাজী প্রমুখ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন করুণাময়ী ভট্টাচার্য, বাপী দাস ও "সারদা মহিলা শাখার" সভ্যাবৃন্দ। তবলা বাজান লক্ষ্মীনারায়ণ দাস। এছাড়া নিত্যদিন গীতা পাঠ, বিশেষ পূজা, হোম, ভোগ, আরত্রিক ভজন ও ভক্তগণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সাভারকরের ডায়েরী উন্মোচন

আগামী ৭ মার্চ রবিবার সকাল ১০টায় কলকাতায় মহাজাতি সদনে বড়বাজার কুমারসভার উদ্যোগে স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকর-এর ডায়েরী 'সিংহ গর্জনা' গ্রন্থটির উন্মোচন হবে।

ভ্রম সংশোধন

গত ২২ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় শোক সংবাদ-এ তপন ঘোষের মাতৃদেবীর প্রয়াণ ৭ ফেব্রুয়ারি ছাপা হয়েছে। ৭ তারিখ নয়, উনি ৯ ফেব্রুয়ারি গত হয়েছেন। স্বঃ সঃ॥

মুসলমানদের অনগ্রসরতার কারণ

(৯ পাতার পর)

তারপর ডাক্তার দেখানো হলো। ডাক্তার বলল—এই এই হয়েছে। ডাক্তার দিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর রোগটা সেরেও গেল। কিন্তু সাবিনা ঠিক করল, তার অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা করার মতো আর্থিক সঙ্গতি আর নেই। তাই সে এবার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করাবে। এটা যখন ঠিক করেছে, তখন স্থানীয় মুসলিমরা বলল—তা কেন? 'অমুক' লোক রয়েছে। ওই 'অমুক' লোকটা 'পীর' বা হোমরা-চোমড়া গোছের একটা কিছু হবে। তার কাছে যাও। যাই হোক, ওই লোকটা নারী পাচারের সঙ্গে যুক্ত ছিল। আরব দুনিয়া ও বোম্বাই-এর সঙ্গে তার ভাল যোগাযোগও রয়েছে।

❑ এই পীরেরা কারা? আর পীরেরা কু-কর্ম করছে কিন্তু মুসলিম সমাজও তা মুখ বুজে মেনে নিচ্ছে কেন?

● পীরেরা কারা তা জানি না। তবে এটা জানি যে তাঁরা যা বলেন তা শোনার জন্য ১ লক্ষ লোক বসে পড়ে। যাই হোক, সাবিনা বলে মেয়েটিকে এমনভাবে 'এক্সপ্লয়েট' করা হলো যে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে জোর করে রেজিস্ট্রি বিয়ে দেওয়ানো হলো। যে লোকটা এই বিয়ের বন্দোবস্ত করল সে হচ্ছে ওই পীরের অনুগত। পরে সেই পীরের নারী-পাচারের বিষয়টা যখন সাবিনা আর তার বাবার কাছে স্পষ্ট হলো, তখন তাঁরা প্রতিবাদও করলেন। কিন্তু দেখা গেল আশপাশের মুসলিমরা পীরটিকে সমর্থন করছেন। ফলে সাবিনারা নিজভূমে পরবাসী হয়ে গেল। আসলে মুসলমানদের মধ্যে খোলামেলা মনের মানুষ খুবই কম আছে। এটাই তাদের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডী। গ্রেট, গ্রেট ট্রাজেডী। এর থেকে তো বলব আমার আদিবাসীরা সবথেকে আধুনিক। কারণ ছেলে জন্মালো না মেয়ে জন্মালো তাতে ওদের কিছু এসে যায় না। অর্থাৎ 'জেন্ডার ডিফারেন্স' নেই। দ্বিতীয়ত, তাদের মধ্যে পণপ্রথা নেই। আর তিন নম্বর কথা হচ্ছে সম্পত্তির ব্যাপারে ওদের ছেলে-মেয়ের সমানাধিকার রয়েছে।

❑ মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটা মুখ্য কারণ হতে পারে অনুপ্রবেশ। সেটা নিয়ে কিছু বলবেন?

● সে তো হচ্ছেই। আজকে কোথাও দেখা গেল ৭ হাজার লোক আছে। তো কালকে সেখানে দেখবে ১৪ হাজার হয়ে গিয়েছে। আমরা মুর্শিদাবাদে দেখেছি নৌকো করে কি বড় আকারে ওপার থেকে লোক এদিকে চলে আসছে। সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে নারী-শিশু বিক্রি করা হচ্ছে। কি করবে তুমি? ভারত-বাংলাদেশ কিংবা অনুপ্রবেশকারী-শরণার্থী এসব বলে কিছু লাভ নেই। যা পরিস্থিতি তাতে ভারতের আর্থ-সামাজিক স্থিতিই এখন বিপন্ন।

❑ খুব ভাল কথা। শেষ দুটো প্রশ্ন আপনাকে করব। প্রথম প্রশ্ন, রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের রিপোর্টকে আপনি সমর্থন করেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তড়িঘড়ি এই রিপোর্টকে কার্যকর করতে চাইছেন কেন? এর মধ্যে তথাকথিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তোষণের গন্ধ আপনি পাচ্ছেন?

● আমি মানুষ দেখি। ওসব রিপোর্ট-টিপোর্ট নয়। দেখেছি নিশ্চই, পড়েছিও নিশ্চই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত ৩৪ বছরে কিছুই করেনি। না বিপিএল তালিকা সংশোধন করেছে, না মানুষকে রেশন কার্ড দিয়েছে। এখন মুসলমানদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলে কি করবে? কারণ যে স্তরে মুসলমানরা দরিদ্র, বঞ্চিত বা অবহেলিত আছেন, সেই স্তরে তো অনেক হিন্দুও রয়েছেন। এখন হিন্দু, মুসলমান বৌদ্ধ বলে কি হবে? সবাই তো মানুষ।

❑ আমাদের সময় দেবার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

● তোমাদের স্বাগত।

সংযোজন ঃ বয়সে অনেক ছোট, কিন্তু মহাশ্বেতাদেবীর গবেষণার সহযোগী জ্যোতিষ্ক রঞ্জন সরকার জানালেন, তাঁদের সাম্প্রতিক গবেষণাটি 'স্ট্যাটাস অব্ স্যাংসক্রিট লিটারেচার ইন তিস্তা-ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি ভিস আ ভিস ইন্ডো-ইউরোপিয়ান গ্রুপ অব ল্যাঙ্গোয়েজস' শীর্ষক। এ প্রসঙ্গে মহাশ্বেতা দেবীর বক্তব্য সংস্কৃত ভাষা থেকেই বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা সমূহের উৎপত্তি। তবে আদিবাসীদের ভাষাও সংস্কৃত থেকে এসেছে কিনা সেটা গবেষণার বিষয়।

পণ্ডিচেরিতে অ্যাকাদেমী গড়ছেন লিয়েণ্ডার

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।। খেলোয়াড় জীবনে তিনি দেশকে দিয়েছেন অনেক গরিমা। রমানাথন কৃষ্ণণ, বিজয় অমৃতরাজরাও যে কীর্তিগৌরবে মহীয়ান হতে পারেননি, সেই গ্রান্ডস্লামও নয় নয় করে দশটি হয়ে গেছে লিয়েন্ডার আড্রিয়ান পেজের। মাইকেল মধুসূদনের যোগ্য বংশধর এবার অ্যাকাদেমি খুলতে চলেছেন পন্ডিচেরিতে। শান্ত, স্নিগ্ধ, আধ্যাত্মরসে সঞ্জীবিত শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীমার সাধনভূমি পন্ডিচেরিকে বেছে নেওয়ার পিছনে লিয়েন্ডারের মননগর্বী জীবনবোধেরই পরিচয় পাওয়া যায়। আর পন্ডিচেরি যে ফরাসিদের 'সেকেন্ড হোম প্যারিস'।

লিয়েন্ডার এই অ্যাকাদেমিটি এক উন্নততর আঙ্গিকে গড়ে তুলতে চান। শুধুমাত্র টেনিস নয়, একাধিক অলিম্পিক খেলার স্বয়ংসম্পূর্ণ পাঠশালা হবে এটি। বিশেষ করে যে সব খেলায় ভারত অলিম্পিকে ভাল ফল করতে পারে। খেলার সঙ্গে জীবনগঠনের অন্যান্য উপযোগী বিষয়গুলিও শিক্ষা দেওয়া হবে। ছেলে-মেয়েদের জন্য প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থাও করা হবে। তারজন্য অরবিন্দ আশ্রমের স্কুলের সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তাও হয়ে গেছে লিয়েন্ডারের। পন্ডিচেরির মুখ্যমন্ত্রী পি বৈশিলিঙ্গম ও তার ক্যাবিনেট মন্ত্রীরাও সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন লিয়েন্ডারকে। বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞদের এনে জমি জরিপ করাও সেরে নিয়েছেন লি। এই অ্যাকাদেমি গড়া তার আশৈশব লালিত স্বপ্ন। এক সাক্ষাৎকারে লিয়েন্ডার বলেছেন, "বিগত চারবছরে যে ভাবে বদলে গেছে ক্রীড়া দুনিয়া তার চেহারায়, চরিত্রে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে ভারতবর্ষকে। ক্রীড়া সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে। অলিম্পিক ইভেন্টে পদক পাওয়ার জন্য পাশ্চাত্যের দেশগুলি যেভাবে উন্নত থেকে উন্নততর প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োজন ঘটিয়ে চলেছে, তা এদেশে বসে বোঝা সম্ভব নয়। এদেশে অবশ্য সাই এই প্রযুক্তির কিছুটা আয়ত্ত করেছে, এর সাহায্যে উঠতি ক্রীড়াবিদদের তৈরি করছে। তবে তা যথেষ্ট নয়। তাই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটা স্তরের পর ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা আর এগোতে পারছে না। এই অবস্থার পরিবর্তন করতে চায় অ্যাকাদেমি।"

লিয়েন্ডারের অ্যাকাদেমি তাই ইতিমধ্যেই স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছে ভারতীয় কচিকাঁচাদের। তার ওয়েবসাইটে জমা পড়েছে কয়েকশো ছেলে-মেয়ের বায়োডাটা, যারা তার অ্যাকাদেমিতে শিক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষা দিতে চায়। আর লিয়েন্ডার নিজে চেন্নাইয়ের বিজয় অমৃতরাজের ব্রিটানিয়া অমৃতরাজ টেনিস অ্যাকাদেমির ফসল। অ্যাকাদেমির গুণগত উৎকর্ষতা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল। প্রয়োজনে বিজয় স্বয়ং এসে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় টিপস দিয়ে যাবেন। তবে যেহেতু এটি হবে সার্বিক এক ক্রীড়া অ্যাকাদেমি, তাই বিভিন্ন খেলার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারটাও মাথায় রাখতে হচ্ছে লিয়েন্ডারকে। যে খেলার জন্য যে ধরনের ট্রেনিং পদ্ধতি দরকার তা যথাযথ অনুসরণ করা হবে। শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও বৌদ্ধিক চাহিদা এবং উৎকর্ষতার ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে তবেই তার জন্য নির্দিষ্ট খেলার দিক নির্দেশ করা হবে।

কুড়ি বছর বিশ্ব নাগরিকের জীবন কাটিয়ে লিয়েন্ডার এবার থিতু হতে চান তার জন্মভূমিতে। কলকাতায় তার বেড়ে ওঠা হলেও তিনি মুম্বাইতে থাকতে চান বাকি জীবন। কয়েক বছর যাবৎ এদেশে আসলে মুম্বাইয়ের ফ্ল্যাটেই ওঠেন। কলকাতায় আসেন, বাবা প্রাক্তন অলিম্পিয়ান তথা ক্রীড়াবিজ্ঞানী ভেস পেজের সঙ্গেও কাটিয়ে যান। যুক্তরাষ্ট্রের অরল্যাণ্ডোতেও তাঁর সুদৃশ একটি আপ্যার্টমেন্ট আছে। তবে খেলা ছাড়ার পর পন্ডিচেরির অ্যাকাদেমিই হবে তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। পবিত্র এই শহরকে তার অ্যাকাদেমির মাধ্যমে ক্রীড়া পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চান তিনি। 'স্পোর্টস ট্যুরিজম' আজ বিদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় এক শিল্প। বহু পর্যটক তাঁর অ্যাকাদেমি দেখতে আসতেন তার দৌলতে পন্ডিচেরিও স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হবে জগৎবাসীর সামনে, এমনটাই মনে করেন লিয়েন্ডার।

খেলার জগৎ

শব্দরূপ - ৫৩৮ কৃশাণু দলুই

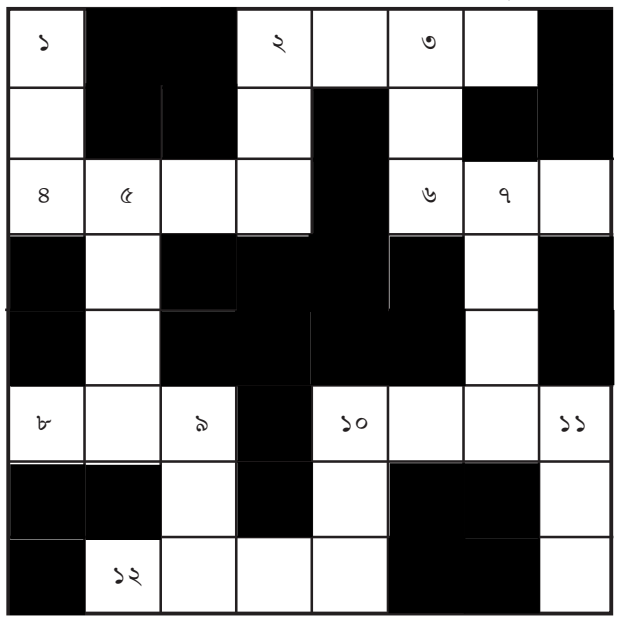

১	■	■	২		৩		■
	■	■		■		■	■
৪	৫			■	৬	৭	
■		■	■	■	■		■
■		■	■	■	■		■
৮		৯	■	১০			১১
■	■		■		■	■	
■	১২				■	■	

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ২. শকুন্তলার প্রধানা সহচরী, মহর্ষি অত্রির স্ত্রী, ৪. বিশ্বামিত্রের একপুত্র, প্রথম দু'য়ে ধন, ৬. স্বনামধন্য দেবর্ষি, শেষ দু'য়ে বাতিল, ৮. বাকবিতণ্ডা, ঝগড়া,
১০. আলংকারিক অর্থে সমান সুখ বা আনন্দ, মধ্যে নশ্বর, ১২. "—হত ইতি গজঃ" শূন্য স্থানে দ্রোণাচার্যের পুত্র।

উপর-নীচ ঃ ১. শিবের রুদ্রমূর্তি, শেষ দু'য়ে শব্দ, ২. হনুমানের মাতা, ৩. এখানে আরম্ভ হবে, ৫. পরম কল্যাণ, বিশেষ শুভ, শেষ তিনে সপ্তাহের এক বার, ৭. সূর্যের রশ্মি বা আলো, ৯. ইন্দ্র, ১০. বিভীষণ পত্নী, ১১. ইনি দিব্যচক্ষু দিয়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ঘটনা ধৃতরাষ্ট্রকে শ্রবণ করান।

সমাধান শব্দরূপ - ৫৩৬

গৃ	হ	দে	ব	তা	■	■	ম
■	র	■	■	প	■	■	ন্দি
■	গৌ	■	■	স	সা	গ	র
কি	রী	ট	■	■	গ্নি	■	■
■	■	নি	■	■	ক	ম	ল
ক	ল	ক	ল	■	■	ন্দা	■
ণা	■	■	হ	■	■	নি	■
দ	■	■	মা	তু	লা	ল	য়

সঠিক উত্তরদাতা

দেবলীনা গঙ্গোপাধ্যায়
চারাবাগান, হাওড়া-৪
ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া
বেড়াবেড়িয়া, বাগনান, হাওড়া-৭১১৩০৩
তুহিনা বিষ্ণু
সিউড়ী, বীরভূম
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৭০০০০৯

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫৩৮ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৫ মার্চ, ২০১০ সংখ্যায়

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা যায় না ?

(৩ পাতার পর)

করেছিলেন। বিচারপতি চন্দ্রচূড় জানিয়েছিলেন—রাষ্ট্রপতি এই ধরনের ব্যাপারে চূড়ান্ত অন্যায় না করলে, আদালত তাঁর 'সন্তুষ্টি' নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে না। বলা চলে—এই মামলায় সর্বোচ্চ আদালতের বক্তব্য ছিল—(১) দেখতে হবে—রাষ্ট্রপতি সংবিধানের অন্য কোনও অনুচ্ছেদকে ধ্বংস করেছেন কিনা এবং (২) তাঁর কাজটার উদ্দেশ্য গর্হিত কিনা বা ক্যাবিনেটের ভ্রান্ত পরামর্শ-জাত কিনা। (জি. এস. পাণ্ডে—কনস্টিটিউশনাল 'ল পৃঃ ৪৭৮)।

অবশ্য ১৯৯৪ সালে বোম্বাই বনাম কেন্দ্রের মামলায় সুপ্রীম কোর্ট এই বিষয়টাকে একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আনতে চেয়েছে এবং এই ব্যাপারে কিছু শর্ত আরোপ করেছে। আদালতের মতে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাটা সংবিধানের এক অলঙ্ঘনীয় সৃষ্টি, সুতরাং অঙ্গ-রাজ্যগুলোর স্বাধিকার ব্যাহত করা যায় না—সেক্ষেত্রে ৩৫৬ নং অনুচ্ছেদকে অত্যন্ত সতর্কভাবে ব্যবহার করতে হবে এবং রাষ্ট্রপতিকে দেখতে হবে যাতে রাজ্যগুলোর স্বাতন্ত্র্য ও সত্তা কোনভাবেই বিনষ্ট না হয়। আদালতের মনে হয়েছে—নাগাল্যাণ্ডে ও মেঘালয়ে ১৯৮৮ সালে এবং কর্ণাটকে ১৯৮৯-এ যে রাষ্ট্রপতি-শাসন জারি করা হয়েছিল, সেটা ছিল অবৈধ। তবে ১৯৯২ সালে রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও হিমাচল প্রদেশে এই কেন্দ্রীয় ক্ষমতার প্রয়োগ নিয়ে কিছু বলার নেই। বলা বাহুল্য, এভাবে সর্বোচ্চ আদালত বিষয়টাকে আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত করে ফেলেছে। তার ফলে এই অনুচ্ছেদটার প্রয়োগ আগের মতো আর সহজ ব্যাপার নয়। বিশেষ করে, কোনও রাজ্যে রাষ্ট্রপতি-শাসন জারি করাকে যদি সুপ্রীম কোর্ট অবৈধ বলে এবং বরখাস্ত সরকারকে আবার ক্ষমতায় বসাতে বলে, তাহলে সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে চরম অস্বস্তিকর ব্যাপারে পরিণত হবে।

কিন্তু তেত্রিশ বছর একটানা শাসন চালানোর ফলে বাম-সরকারের মধ্যে যে লোভ-লালসা, পাপ, দম্ভ, দুর্নীতি ও পৈশাচিকতা জন্মেছে এবং সাম্প্রতিককালে তার নির্লজ্জ ও নিষ্ঠুর প্রতিফলন ঘটেছে, তাতে তাকে আর এক মুহূর্তও ক্ষমতায় রাখা যায় না। সরকারের কোনও কোনও মন্ত্রীও বলেছেন, সরকারের উচিত অবিলম্বে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে জনমত যাচাই করা। অবশ্য তাতে ফল কি হবে—সেটাও বোঝা গেছে। বিধানসভার উপ-নির্বাচনে, পঞ্চায়েত নির্বাচনে, মিউনিসিপ্যালিটিতে, স্কুল পরিচালনা বোর্ডে, কলেজের ছাত্র-সংসদের নির্বাচনে, বিভিন্ন অফিস-আদালতে শাসক-দলের ক্রমাগত ভরাডুবি ঘটে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী বারবার পদত্যাগ করতে চেয়েছেন বলে জানা গেছে। তাঁর ভ্রান্ত ও সর্বনাশা নীতির ফলে ঘরে-বাইরে তিনি এখন পরিত্যক্ত। বিভিন্ন স্থানে তাকে কালো পতাকা দেখতে হয়েছে। অনেক মন্ত্রীও তাঁকে প্রকাশ্যে নিন্দিত করেছেন। প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রসচিব তাঁর মিথ্যাচার ফাঁস করে দিয়েছেন। কোনও কোনও মন্ত্রী তাঁর সভায় এসেছেন দেরীতে।

নন্দীগ্রামে ১৪টা লাশ যখন পাওয়া গিয়েছিল তাঁর নিষ্ঠুরতার ফলে—তিনি তার দায় স্বীকার করেছিলেন, তাঁর কিন্তু তখনই সরা উচিত ছিল। কিন্তু ক্ষমতা-লোভ হয়ত পৃথিবীর সব চেয়ে জঘন্য লোভ—তাই তিনি সরেননি। সেক্ষেত্রে ৩৫৬ নং অনুচ্ছেদের আশ্রয় নিলে ক্ষতি কি?

কয়েকটা কথা মনে রাখা দরকার—

● যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কোনও লক্ষ্য (end) নয়, মাধ্যম (means) মাত্র। মূল লক্ষ্যটা হলো জনকল্যাণ। যেই রাজ্য-সরকার সেই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে শিল্পপতিদের সঙ্গে 'trade-secret'-এ আবদ্ধ হয়, তার রাজ্য-শাসনের নৈতিক অধিকার থাকে না।

● গণতন্ত্রও একটা বুলি নয় কিন্তু, এর তাৎপর্য্য মানুষের প্রতি সেবার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। ভ্রান্ত শিল্পায়নের লক্ষ্যে এই সরকার পুলিশ-ক্যাডারের যৌথ বাহিনীকে দিয়ে হত্যা করেছে বহু মানুষকে, আহত করেছে কয়েক শ' কৃষককে, ধর্ষণ করা হয়েছে অনেক অসহায় নারীকে। হাইকোর্ট নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি।

গু সংবিধানই ১৯নং অনুচ্ছেদ ও ২১ নং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে মানুষকে দিয়েছে মতপ্রকাশ করা, মিটিং-মিছিল করা, যাতায়াত করা এবং জীবিকা বেছে নেওয়ার অধিকার। এগুলোও লঙ্ঘিত হয়েছে। রাজ্য-সরকার কৃষককে মালী, দারোয়ান, দোকানদার, চাকরে পরিণত করতে চেয়েছে। আহতদের দেখতে চেয়েছেন বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের আটকানোর জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে বারবার, হাইকোর্টও তার নিন্দা করেছে। গ্রেপ্তার ও দৈহিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়েছে শ্রদ্ধেয় শিল্পী-কবি-অধ্যাপকদের।

● রাজ্যপাল তার ক্ষমতার সীমার মধ্যে থেকেই সংযতভাবে এই সব ব্যাপারে পরোক্ষ প্রতিবাদ করেছেন—তাঁকে আশালীন ভাবে গালিগালাজ করা হয়েছে। তাঁর মধ্যস্থতায় রাজভবনে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে—পরেরদিনই চুক্তিটা সরকার ছিঁড়ে ফেলেছে।

● হাইকোর্টের বিচারপতিকেও বিশ্রীভাবে অপমানিত করা হয়েছে।

● সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, কেশপুর, সূচপুর, গড়বেতা, নানুর, ঘাটাল প্রভৃতি স্থানে হাজার হাজার মানুষকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, বাইক-বাহিনী এলাকা দখল করেছে বোমা-বন্দুক নিয়ে, পুতুলের মতো দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে বশংবদ পুলিশকে। আমলাদের করা হয়েছে দলদাস।

● আইন-শৃঙ্খলা নাকি রাজ্যের ব্যাপার—তাহলে এত কোম্পানী কেন্দ্রীয় বাহিনীকে আনা হল কেন? এটাই কি প্রমাণ নয় যে, রাজ্য-সরকার ব্যর্থ? আর এত মাসেও কেন স্বাভাবিক করা গেল না অশান্ত জঙ্গলমহলকে? এটা শুধু মাওবাদীদের দৌরাত্ম্য, নাকি সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিদ্রোহ?

● কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের কেন যেতে দেওয়া হল না উপদ্রুত অঞ্চলে? কি লুকোতে চেয়েছে রাজ্য-সরকার?

● প্যারোলে ৩২ বছর অসামীরা মুক্ত থাকতে পারে? ২৭ বছর জামিন-অযোগ্য পরোয়ানা নিয়ে মন্ত্রীত্ব করা চলে? স্বাভাবিক অবস্থা থাকলে অপরাধী 'রামবাবু' পরে 'শ্যামবাবু' সেজে নেতা হতে পারে?

এর পরেও ৩৫৬ নং অনুচ্ছেদকে কাজে লাগানো যায় না? তাহলে এটাকে সংবিধানে রাখার দরকার কি?

নোয়াখালির নির্যাতিত নর-নারীর চিঠি ও গান্ধীর কমোড

দীনেশচন্দ্র সিংহ

> "গান্ধীজীর কাছে তো মুসলমানদের সাত খুন মাপ। মুসলমানদের চরিত্রের উপর এই কলঙ্ক আরোপে, যা কাল্পনিক নয়—নগ্নসত্য, তিনি মনে ব্যথা পেতে পারেন এবং এসব পত্র যাতে অন্য কারো হাতে না পড়ে বা নজরে না আসে, সেকারণেই ওই জাতীয় চিঠি নিজের কাছে রেখে দিতেন এবং ভবিষ্যতে সুযোগ মতো এগুলি নষ্ট করে ফেলতেন।"

গান্ধীবাদকে বরবাদ করে গান্ধীজীর ছেঁড়া চটি, ফুটো ছাতি ও ঘূণেধরা লাঠি সংগ্রহ সংর(ণ ও পূজনের প্রথা চলছে দীর্ঘকাল ধরে এবং তজ্জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে সরকারি কোষাগার থেকে। গান্ধীজীকে যদি হত্যা করে থাকে নাথুরাম গডসে, তবে গান্ধীবাদকে খতম করেছে তাঁর মানসপুত্র জওহরলাল। আর তারপরই শু(হয়েছে গান্ধীজীর পরিত্যক্ত(বা ব্যবহৃত বাসনকোসন, বিছানা বালিশ, লেপতোষক, পাটি চটি পূজা ও এসবের সামনে নেতাদের জোড়হস্তে প্রণতি জানাবার ধুম।

অতি সম্প্রতি নিউইয়র্ক শহরে গান্ধীজীর ব্যবহৃত বলে কথিত পাঁচটি জিনিসের নিলাম নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে যে টানাপোড়েন চলছে, তা 'স্লামডগ মিলিওনারে'র মতোই এক নির্বাচনী 'গিমিক' বা চমক। গান্ধীজীর নাম ভাঙিয়ে মদ্য ব্যবসায়ী বিজয় মালিয়া ও গান্ধীজীর উত্তরাধিকারিত্বের অবৈধ দাবিদার ভারতের বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর নির্বাচনী কৌশল নয় তো?

একটি প্র(্ন কেউ তুলছে না, এসব স্মারকদ্রব্য যিনি নিলামে চড়ালেন সেই মিঃ জেমস ওটিসের হাতে এগুলি গেল কি করে? এবং এগুলি সবই গান্ধীজীর ব্যবহৃত কিনা। পিতলের থালাবাটির কথাই ধরা যাক। নোয়াখালি জেলার পাদপরিত্র(মা কালে গান্ধীজী কি ধরনের খাবার খেতেন এবং কেমনভাবে সে খাবার তৈরি হতো তা তাঁর এক সফর সঙ্গীর বর্ণনা থেকে জানা যায়। যেমন ঃ—

"নির্মলবাবু একটি ছেলেকে ঠিক করে শি(া দিয়েছিলেন কীভাবে গান্ধীজীর খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করতে হয়।...গান্ধীজী ভাপে সেদ্ধ অথবা আমাদের দিশি মতে যাকে অল্প আঁচে ফেনসুদ্ধ পোরের ভাত হয়, সেইরকম খাওয়াই পছন্দ করতেন। মশলা কিছুই লাগে না, লবণ খেতেন কিনা এখন মনে নেই। গুড় খেতেন, কিন্তু চিনি চলত না। ছেলেটি যত্ন করে সব তৈরি করে পাথর বা কাঠের থালায় একেবারে মিহি করে চটকে গান্ধীজির সামনে দিত, কাঠের চামচে করে তিনি খেতেন।" (নোয়াখালির দুর্যোগের দিনে—অশোকা গুপ্ত)

এখানে কিন্তু পেতলের থালাবাটি ব্যবহারের কোনও উল্লেখ নেই। তাহলে নিলামে ওঠা পেতলের থালাবাটি কি সত্যিই গান্ধীজির ব্যবহৃত দ্রব্য? না তাঁর অপর কোনও সফরসঙ্গীর কিংবা নোয়াখালি পর্যায়ের পূর্বে তিনি পেতলের থালাবাটি ব্যবহার করতেন?

নিলামে চড়ান ট্যাঁক ঘড়িটি গান্ধীজীর সেই হারিয়ে যাওয়া বিখ্যাত ঘড়িটি নয় তো? এই ঘড়ি এবং একটি গু(ত্বপূর্ণ ফাইল হারানোরও ইতিহাস আছে।

"এই সময় বিহারে দাঙ্গাবিধ্বস্ত মানুষের ভিড়ের মধ্যে তাঁর ট্যাঁক ঘড়িটিও হারিয়ে গিয়েছিল।" (বঙ্গ সংহার এবং—সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত)

বিহারে হারিয়ে যাওয়া এই ট্যাঁক ঘড়িটিই ৬২ বছর পর নিউইয়র্কে নিলামে চড়েনি তো? তাঁর সফরসঙ্গী কোনও দেশী/বিদেশী সাংবাদিক/অসাংবাদিক তালেগোলে ঘড়িটিকে হাফিস করে দেননি তো? গান্ধীজীর ব্যবহৃত অনেক তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিসও প্রচারের দৌলতে বি(্বখ্যাতি ও খাতির পেয়েছে(মহাপু(ষের ব্যবহৃত বলে শ্রদ্ধা ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সর্বাধিক প্রয়োজনীয় ও প্রাতঃস্মরণীয় বস্তুটির প্রতি কারোও নজর নেই। সে বিষয়টি সম্পর্কে গান্ধীজীর সফর-সঙ্গী সাংবাদিক লিখেছেন ঃ—

"গাঁন্ধীজীর ব্যবহারের জন্য একটি বেসিন ও একটি কমোডের ব্যবস্থা সতীশ দাশগুপ্ত করেছিলেন। গাঁন্ধীজি যখন নোয়াখালি ও ত্রিপুরার হাঙ্গামা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে 'এক গ্রামে একরাত্রি' সফর আরম্ভ করেন, তখন দেখতাম তাঁর কমোড ও বেসিন কেউ মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছেন। আমরা হাসাহাসি করতাম।" (হস্তান্তর—শংকর ঘোষ)

জওহরলাল নেহ(গান্ধীজীর সঙ্গে সা(াৎ ও পরামর্শ করতে শ্রীরামপুর (নোয়াখালি) গেলে তাঁর ব্যবহারের জন্য গান্ধীজী কমোডটি নেহ(জীর ঘরে পাঠান। তবে তিনি সেটি ব্যবহার না করে স্থানীয় প্রথায় কাজ সারেন এবং কমোডটি গান্ধীজীর ঘরে ফেরত পাঠান। গান্ধীজীর নিত্য প্রয়োজনীয় ও প্রাতঃকৃত্যের জন্য অত্যাবশ্যক চলমান কমোডটি কোথায় গেল সে সম্পর্কে কোনও উচ্চবাচ্য শোনা যায় না। সুতরাং গান্ধীজী ও নেহ(জীর স্মৃতি বিজড়িত এরকম একটি জাতীয় গু(ত্বপূর্ণ স্মারকদ্রব্যের খোঁজখবর করা এবং সেটিকে উদ্ধার করে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা ও সম্মান প্রদর্শন করাই জাতীয় কর্তব্য বলে মনে করি। তাতে গান্ধীজীর আত্মা তৃপ্তি ও শান্তি পাবে এবং গান্ধীভক্ত(দের উপর তাঁর অকৃপণ আশীর্বাদ বর্ষিত হবে!

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা। ১৯৪৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারি নোয়াখালি জেলায় তাঁর পাদ-পরিত্র(মা অসমাপ্ত রেখে এবং হিন্দু-মুসলিম মিলনে তাঁর স্বপ্ন ও সাধনার ব্যর্থতা অনুভব করেই গান্ধীজী নোয়াখালি ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তার পরের ঘটনা সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্তের কলম থেকে ঃ—

"তিনি (গান্ধীজী) নোয়াখালি থেকে বিহার রওনা হলেন। কেজি থেকে ডাউন চিটাগাং এক্সপ্রেস ধরে সোদপুর স্টেশনে নামলেন (৩ মার্চ ১৯৪৭)। সোদপুর আশ্রমে পৌঁছে দেখলেন তাঁর একটি ব্যক্তি(গত ফাইল পাওয়া যাচ্ছে না। খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন গান্ধীজী। কেজি থেকে চাঁদপুর, সেখান থেকে গোয়ালন্দ এবং গোয়ালন্দ থেকে সোদপুরের দীর্ঘ যাত্রাপথে গান্ধীজীকে ট্রেনে, স্টীমারে, আবার ট্রেনে উঠতে হয়েছিল। এই সমস্ত জায়গায় সরকারি ও বেসরকারি লোকেরা ফাইলটির সন্ধান করলেন। কিন্তু লাল মলাটের সেই ফাইলটি পাওয়া গেল না।"

সঙ্গত কারণেই একটি কথা মনে জাগে। নোয়াখালিতে গান্ধীজীর সকলপ্রকার কাগজপত্রের তত্ত্বাবধানে ছিলেন অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু। সেখানে গান্ধীজীর নিজস্ব ফাইল বলে কোনও ফাইল থাকার কথা নয়। আর লাল মলাটের ফাইলে এমন মহার্ঘ বস্তু কি থাকতে পারে, যার জন্য গান্ধীজী এত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। আরও আশ্চর্যের বিষয় নোয়াখালিতে গান্ধীজীর প্রায় তিন মাস অবস্থানের খুঁটিনাটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাটিও নির্মল বসুর ডায়েরিতে স্থান পেয়েছে(অথচ গান্ধীজীর গু(ত্বপূর্ণ ফাইল হারানোর উল্লেখমাত্র নেই, যদিও নোয়াখালি থেকে সোদপুরে ফেরার সময় অন্যান্যদের মধ্যে নির্মলবাবু ছিলেন অন্যতম সঙ্গী।

একটি কথা অনুমান করা সঙ্গত হবে কিনা ভাবছি। নোয়াখালিতে গান্ধীজী অত্যাচারী মুসলমানদের জঘন্য কার্যকলাপের তীব্র ভাষায় কোনও নিন্দা করেননি(তাদের অমানুষিক ব্যবহারের জন্য ভর্ৎসনাও করেননি। কেবল মিলেমিশে থাকতে এবং মুসলমানদের প্রতি কোনও বিদ্বেষভাব পোষণ না করতে হিন্দুদের উপদেশ দিয়েছেন। আর কোরানে বিধর্মী বিদ্বেষ নেই বলে ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু নোয়াখালির বেশ কিছু হিন্দু নরনারী তাদের উপর যে বর্বরোচিত অত্যাচার করা হয়েছে—হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ, ধর্মান্তর, বলাৎকার, অপহরণ ইত্যাদি পাশবিক আচরণ করা হয়েছে—তার বিশদ বিবরণ দিয়ে গান্ধীজীর কাছে লিখিত ভাবে অভিযোগ জানিয়েছিল। এখন, গান্ধীজীর কাছে তো মুসলমানদের সাত খুন মাপ। মুসলমানদের চরিত্রের উপর এই কলঙ্ক আরোপে, যা কাল্পনিক নয়—নগ্নসত্য, তিনি মনে ব্যথা পেতে পারেন এবং এসব পত্র যাতে অন্য কারো হাতে না পড়ে বা নজরে না আসে, সেকারণেই ওই জাতীয় চিঠি নিজের কাছে রেখে দিতেন এবং ভবিষ্যতে সুযোগ মতো এগুলি নষ্ট করে ফেলতেন। এই সম্ভাব্য আশঙ্কা থেকেই অধ্যাপক বসু হয়তো উক্ত(ফাইলটি সরিয়ে ফেলেন। আর তার ফলেই ধনজন হারা, বিষয় সম্পত্তিহারা, মান-ইজ্জত হারা, ধর্ম-সংস্কৃতি হারা হিন্দু নরনারীর ক(ণ কাহিনী এবং দাঙ্গাবাজ মুসলমানদের জন্তুর চরিত্রের পরিচয় পরবর্তী প্রজন্মের প((জানার সুযোগ ঘটেছে।

Swastika
1 March - 2010, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই...

কাত্যায়নীদেবী ঠিকই বলেছেন। লোকে লোকারণ্য শোভাবাজার রাজবাড়িতে ১৮৯৭ খৃস্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি দিগ্বিজয়ী বীর স্বামী বিবেকানন্দকে সংবর্ধনা জানানো হচ্ছে।

অর্ণব নাগ ঃ না, আর যেখানেই হোক, সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে প্রাণ জুড়নো সম্ভব নয়। কারণ মাতৃভূমি তাঁকে টানছে। চার বছর ব্যাপী 'বিলাসের লীলাভূমি, গৌরবমুকুটধারী, মহাশক্তিশালী' পাশ্চাত্যভূমিতে ভ্রমণের পর তাঁর কাছে মাতৃভূমি প্রতিভাত হচ্ছে এইভাবে—"পাশ্চাত্যভূমিতে আসবার আগে ভারতকে আমি ভালবাসতাম। এখন ভারতের ধূলিকণা পর্যন্ত আমার কাছে পবিত্র, ভারতের বাতাস আমার কাছে পবিত্র, ভারত আমার কাছে তীর্থস্বরূপ।" এমন মন্তব্য একজনই করতে পারেন এবং নিঃসন্দেহে তাঁর নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত, উত্তরকালের স্বামী বিবেকানন্দ। অর্থাৎ তিনি প্রত্যাবর্তন করছেন ভারততীর্থে।

গোঁড়া বঙ্গবাসীর 'কালাপানি'র ধন্দ ও দ্বন্দ্ব কিছুই তখনও কাটেনি। এ নিয়ে বেশ ঘাবড়ে যাওয়া ২১শে জানুয়ারি, 'ইন্ডিয়ান মিরর'-এর এহেন মহান ও দেশ-প্রেমমূলক কাজে সাহায্যের জন্য সমাজের সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরই এগিয়ে আসা উচিত। এক্ষেত্রে টাকার প্রশ্ন যেন না ওঠে। স্বামীজীর মহিমার উপযুক্ত হয়—যে সংস্কৃতি ও দেশপ্রেমের অহংকার বাংলা করে, তার উপযুক্ত হয়।"

বলা বাহুল্য, 'ইন্ডিয়ান মিরর'-এর এই আবেদন সেদিন বৃথা যায়নি। ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭ সালে রাতেরবেলায় এস. এস. মোসাম্বা জাহাজে করে স্বামীজি এলেন বজবজে। সারারাত জাহাজে কাটিয়ে পরের দিন বজবজ থেকে শিয়ালদহের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। তারপরে কি হলো, সে কথায় পরে আসা যাবে। কিন্তু তার আগে বলে রাখা দরকার যে ১১৩ বছর আগের সেই 'অ্যাকশান রিপ্লে'র সাক্ষী রইলো ২০১০-এর বৃহত্তর কলকাতা। ১৮৯৭-এ বজবজ স্টেশন ছিল লোকে-লোকারণ্য। আর

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের সিমলার বাড়ির সামনে বিবেকানন্দের কলকাতা প্রত্যাবর্তন উদ্‌যাপন সমিতির মহামিছিল। ছবি ঃ শিবু ঘোষ

প্রতিবেদনটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রতিবেদনটি এই রকম—"তিনি কলকাতার বাঙালী, সুতরাং কলকাতার সকল বাঙালী এগিয়ে এসে তাঁকে প্রাণের অভ্যর্থনা জানান। জঘন্য ধিক্কারের বিষয় হবে যদি এই অবশ্যকর্তব্য পালনে আমরা ব্যর্থ হই। আসুন আমরা মাদ্রাজের পথ অনুসরণ করি।...এক্ষুণি একটি কমিটি গঠন করা হোক—তাঁকে কিভাবে মানপত্র দেওয়া হবে এবং কিভাবে তাঁর অমূল্য কাজের সমাদর করা হবে, তা স্থির করার জন্য। (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) স্বামীজীকে সংবর্ধনা জানানো হবে। কিন্তু সেই কলেজের ছেলে-ছোকরারা ভাবতেই পারছিল না যে স্বামীজীকে টানার ক্ষমতা রাখে পশুপতিনাথের বাড়ির দুটি অবলা জীব মানে ঘোড়া দু'খানা, সুতরাং ঘোড়াদুটিকে গাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ছাত্র আর যুবকরাই টেনে নিয়ে চলল 'স্বামী বিবেকানন্দ সম্বলিত' ঘোড়ার গাড়িখানি। সার্কুলার রোডের 'জয় স্বামীজী', হ্যারিসন রোডের 'জয় রামকৃষ্ণ' তোরণ দুটি পেরিয়ে রিপন কলেজের দরজায় 'স্বাগত' লেখা তোরণের সামনে এসেই গোল বাধল। এত মানুষ ধরবে কোথায়? অগত্যা, গাড়ি ঘুরল পশুপতিনাথের বাড়ির দিকে। বাগবাজারের নিজের বাড়ির মূল ফটকের সামনে স্বয়ং পশুপতিনাথ বসু স্বামীজীকে প্রণাম করলেন। নিয়ে যাওয়া হলো দোতলার বিশালাকৃতি হলঘরে। বহুদিন পর রাখাল মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), যোগানন্দ স্বামী ও অন্যান্য গুরুভাইদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হলো। আর তার পরেই ঘটল সেই অবিস্মরণীয় সংলাপ। আবেগাপ্লুত কণ্ঠে স্বামীজী বললেন—'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু' (গুরুপুত্র গুরুর মতোই সম্মানীয়)। তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ—'জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সম পিতা' (বড় ভাই, বাবারই মতো)। সেই বাড়িরই উত্তরপুরুষ অমিত বসু বেশ গর্ব করে জানালেন—'সেদিন (১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭) স্বামীজি আমাদের বাড়িতেই দুপুরে মধ্যাহ্নভোজ সেরেছিলেন।'

তবে স্বামীজীর আসল সংবর্ধনা হয়েছিল ২৮শে ফেব্রুয়ারি, শোভাবাজার রাজবাড়িতে। কলকাতা ঝেঁটিয়ে সব গণ্য-মান্য ব্যক্তিই সেদিন উপস্থিত হয়েছিলেন সেখানে। শোভাবাজার রাজবাড়ি মেয়েদের ব্যাপারে বরাবরই বেশ রক্ষণশীল। স্বামীজির মুখনিঃসৃত পাঁচটি শব্দ চিকাগোর বিশ্বধর্ম মহাসভায় তোলপাড় ফেলে দিয়েছিল। তিনি শ্রোতৃবর্গকে সম্বোধন করেছিলেন এই বলে—'সিস্টারস অ্যান্ড ব্রাদার্স অব্ আমেরিকা'। কিন্তু শোভাবাজার দেববাড়ি-র মুক্ত প্রাঙ্গণে শুধুই 'ব্রাদার্স'দের ভিড়, 'সিস্টার'রা সকলেই অন্দরমহলে। সেই কারণে স্বামীজী 'ডিয়ার ব্রাদার্স' বলেই সম্বোধন করলেন। স্বামীজী বসেছিলেন পুবদিকে মুখ করে। তিনি দেখতে পাননি। নইলে জানতে পারতেন সেই অগণিত ভিড়ে একটি বারো বছর বয়স্কা বালিকাও ছিলেন। নিতান্তই বালিকা, তাই একমাত্র তাঁরই অনুমতি মিলেছিল 'বাহির-দৃশ্যে' স্বামীজীকে অবলোকন করার। মেয়েটির নাম ক্যাতায়নী দেব (ঘোষ)।

এঁরই পিতা ঠাকুর রামকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত জ্যোতিন্দ্রনারায়ণ দেব। যাঁর আহ্বানে এঁদের আদিবাড়ির কুলদেবতা গোবিন্দ জিউকে দর্শন করতে এসেছিলেন স্বয়ং রামকৃষ্ণ ঠাকুর। ক্যাতায়নী দেবীর এক উত্তরপুরুষ প্রতীপ দেব এই প্রতিবেদককে শোনাচ্ছিলেন সেকথা—'দিদিমার (ক্যাতায়নী দেবী) মুখে শুনেছি, স্বামী

শোভাবাজার রাজবাড়িতে এই সেই পুণ্যস্থান, যেখানে স্বামী বিবেকানন্দ বসেছিলেন। ছবি ঃ শিবু ঘোষ

বিবেকানন্দের সম্বর্ধনার দিনটিতে মাঠে তিল-ধারণের স্থান ছিল না। স্বামীজী যে জায়গায় বসেছিলেন সেটা আমরা গতবছর মার্বেল দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছি।'

এ-প্রসঙ্গে একটা কথা জানিয়ে রাখা ভাল যে, প্রথমে দ্বারভাঙ্গার মহারাজকে সভাপতি করে স্বামীজীকে অভ্যর্থনা দেবার জন্য 'অভ্যর্থনা সমিতি' গঠিত হলেও, কোনও রহস্যজনক কারণে তিনি সংবর্ধনার দিন উপস্থিত থাকতে পারেননি। অগত্যা শোভাবাজার রাজবাড়ির বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরই সেইদিন সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন। আর বিশ্ব কাঁপানো জাতীয় জাগরণের মন্ত্রটি স্বামীজী দিয়েছিলেন শোভাবাজারে স্যার রাধাকান্ত দেবের বাড়ির এই প্রাঙ্গণেই—'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'

১৯ ফেব্রুয়ারি স্বামীজির ভারত প্রত্যাবর্তনের ঐতিহাসিক দিনটিকে স্মরণ করে আলমবাজার মঠ গত দু'বছর ধরে বজবজ থেকে শিয়ালদহের উদ্দেশ্যে বিশেষ ট্রেনে করে, তারপর শিয়ালদহ থেকে স্বামীজির বাড়ির সামনে দিয়ে আলমবাজার মঠ পর্যন্ত সুদীর্ঘ পদযাত্রার আয়োজন করছে। ১৮৯২ থেকে '৯৮ পর্যন্ত দীর্ঘ ছ'বছর ঠাকুরের সন্ন্যাসী ভক্তদের লীলাক্ষেত্র বলতে তো ছিল এই আলমবাজার মঠই।

কথাপ্রসঙ্গে হেমন্ত মহারাজ জানালেন, 'একটা সময় আলমবাজার মঠ যখন অপাংক্তেয় হয়ে পড়েছিল তখন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী সত্যানন্দ এই মঠ উদ্ধারে এগিয়ে আসেন। বিক্রি হওয়া এই মঠের কিছু অংশ ৩৫,০০০ টাকার বিনিময়ে তিনি কিনে নেন।' বাকি ১৬ কলা পূর্ণ করেন স্বামী ভদ্রেশ্বরানন্দ। ইনিই ৩৫ লাখ টাকায় মঠের বাকি অংশটা কিনে নেন ২০০২ সাল নাগাদ। বর্তমানে মঠের দায়িত্বভার চমৎকার ভাবে সামলাচ্ছেন স্বামী সারদাত্মানন্দ (মধু মহারাজ)।

প্রকাশিত হবে ১২ এপ্রিল, '১০
স্বস্তিকা
প্রকাশিত হবে ১২ এপ্রিল, '১০
নববর্ষ সংখ্যা - ১৪১৭
মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট হিন্দুত্বকে জীবনধারা বললেও আমাদের ধর্মীয় এবং সমাজজীবনে হিন্দুত্ব এক ঘুমিয়ে থাকা পরশপাথর। ধর্মান্তরকরণ আর ধর্মনিরপেক্ষতার অক্টোপাশে হিন্দুরা আজ আবদ্ধ। দেশভাগ এবং অনুপ্রবেশের বিড়ম্বনায় হিন্দুরা আজ আশঙ্কিত। বস্তুত বাঙালি হিন্দুর ভবিষ্যৎ কি? কেমন রয়েছে পদ্মাপাড়ের হিন্দুরা—এসব নিয়েই স্বস্তিকার বিশেষ নববর্ষ সংখ্যা।
।। রঙিন প্রচ্ছদ।। গ্রন্থকারে প্রকাশিত হচ্ছে।। দাম ঃ দশ টাকা।।
২৭ মার্চের মধ্যে এজেন্টরা কপি বুক করুন।

Steelam
EXCLUSIVE FURNITURE
স্টীলম ত্রর ..... পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে
Exclusive Show Room
দেওয়া হইবে॥
Factory :- 9732562101

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক ঃ বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com